একক ২ ❐ গান্ধী এবং জনমুখী রাজনীতি ১৯২১-৪২

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ স্বাধীনতা সংগ্রামে জনগণ এবং জনমুখী রাজনীতি

২.৩ খিলাফত - অসহযোগ আন্দোলন ১৯২১-২২

২.৩.১ খিলাফত এবং ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়

২.৩.২ গান্ধী, খিলাফত এবং অসহযোগ আন্দোলন

২.৩.৩ অসহযোগ আন্দোলনের ধারা এবং প্রকৃতি

২.৩.৪ আন্দোলন প্রত্যাহার

২.৪ আইন অমান্য আন্দোলন

২.৪.১ প্রেক্ষাপট-ভারতীয় রাজনীতি ১৯২২-২৮

২.৪.২ আন্দোলনের ধারা এবং প্রকৃতি

২.৪.৩ গান্ধী-আরউইন চুক্তি দ্বিতীয় গোলটেবিল বেঠক এবংপরবর্তী রাজনীতি

২.৫ নির্বাচনের রাজনীতি থেকে ভারতছাড়ো আন্দোলন

২.৫.১ ১৯৩৫ ভারত শাসন আইন এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস সরকার

২.৫.২ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ভারতেররাজনীতি

২.৫.৩ ভারত ছাড়োআন্দোলন

২.৬ সারাংশ

২.৭ অনুশীলনী

২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

২.০ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ে আপনি জানতে পারবেন ঃ

- স্বাধীনতা সংগ্রামে জনমুখী রাজনীতির প্রকৃতি।

- অসহযোগ, আইন অমান্য এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, ধারা এবং প্রকৃতি।
- আন্দোলনগুলির অন্তবর্তীকালীন রাজনীতির ধারা।

২.১ প্রস্তাবনা

বিংশ শতাব্দীর বিশ থেকে চল্লিশের দশকে ভারতের রাজনীতিতে যে পরিবর্তনগুলি চোখে পড়ে সেগুলির প্রভাব স্বাধীন ভারতের রাজনীতিতেও সমানভাবে দেখা যায়। বিশের দশকের আগে যে সংকীর্ণ সংসদীয় রাজনীতি প্রচলিত ছিল, এই সময় থেকে তার অবসান ঘটে, রাজনীতির আঙিনায় প্রবেশ করে আম জনগণ।

এই এককে আপনি জানতে পারবেন সংকীর্ণ রাজনীতির বেড়াজাল ভেঙে কীভাবে রাজনীতিতে জনসাধারণের প্রবেশ ঘটে। ভারতীয় রাজনীতিকে এভাবে জনমুখী করে তোলার ক্ষেত্রে সংসদীয় রাজনীতিতে ঘটা পরিবর্তন এবং গান্ধীর নতুন রাজনৈতিক ব্যাকরণ যৌথ প্রক্রিয়ার রূপ নেয়। তবু রাজনীতিতে জনমুখীনতা একবারে আসেনি, তা এসেছিল দফায় দখায়—মূলত নিটি উপমহাদেশব্যাপী জন আন্দোলনের মাধ্যমেঙ্গ এই এককে জন আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতীয় রাজনীতির জনমুখী হয়ে ওঠার ইতিহাস আলোচিত হবে।

২.২ স্বাধীনতা সংগ্রামে জনগণ এবং জনমুখী রাজনীতি

ববিংশ শতাব্দীর রাজনীতিতে যে বৈশিষ্ট্য বিশ্বজুড়ে দেখা গেছে তা হল রাজনীতির আঙিনায় জনগণের প্রবেশ। শিল্প সভ্যতার যুগে আদুনিক সমাজে সাধারণ লোকের গুরুত্ব কতকটা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায়। রাজনীতিতে এই বর্ধিত গুরুত্বের প্রতিফলন দেখা যায় প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনীতির তত্ত্বের মধ্যেঙ্গ উনবিংশ শতাব্দীতে এই প্রতিনিধিত্বের তত্ত্বের আবির্ভাব ঘটলেও সর্বসাধারণের রাজনৈতিক অধিকার — নারী পুরুষ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে—বিংশ শতাব্দীর আগে কোথাও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পায়নি।

ভারতবর্ষে রাজনীতির আঙিনায় সর্বসাধারণের প্রবেশ ঘটে বিংশ শতাব্দীতে বিশেষ দলকে। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সংসদীয় সভার বা সরকারী অলিন্দের বাইরে নিয়ে এসে গান্ধী এই পথ সুগম করে দিয়েছিলেন। সশস্ত্র বিপ্লবের পথ ছাড়াও প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয় প্রতিবাদ করা সম্ভব—এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হয় গান্ধীর নেতৃত্বে জন আন্দোলনের মাধ্যমে। অহিংস, নিয়ন্ত্রিত, বিশাল জন আন্দোলন মেন একদিকে ভারবাসীর রাজনৈতিক সচেতনাতা বাড়িয়েছিল, তেমনই ব্রিটিশ শক্তির সামনে তুলে ধরেছিল বিশাল এক চ্যালেঞ্জ। দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ব্রিটিশ শক্তি উপলব্ধি করতে শুরু করে, যে ''মূক শতসহস্র'' ভারতীয়দের কল্যাণে অছিলায় তারা সাম্রাজ্যের নৈতিক অধিকার দাবি করে এসেছিল, সেই শতসহস্র মূক ভারতীয় সর্বসাধারই উঠে দাঁড়ানোতে শাসনের তৈতিক অধিকার তারা হারাতে চলেছে। ১৯২০ থেকে ১৯৪৭-এ তাই ধীরে ধীরে মূল প্রশ্ন ভারতবর্ষ স্বশাসনের অধিকার পাবে কনা তাছিল না। মূলপরশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল কত তাড়াতাড়ি কতটা অধিকার পাবে।

ভারতীয় রাজনীতিবিদ্‌দের পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের রাজনীতিতে প্রবেশের অন্য তাৎপর্যও ছিল। ইতোপূর্বে সমাজের শিক্ষিত, প্রতিপত্তিশালী গোষ্ঠীগুলির স্বার্থই রাজনৈতিক দাবি-দাওয়ায় ফুটে উঠত। সর্বভারতীয় যে বিষয়গুলির দিকে নজর দেয়া হত (যেমন ভারতীয় শিল্প ব্যবস্থার পতন, কৃষির দূরবস্থা, ব্রিটেনের বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক নীতি) তাতে সর্বসাধারণের দৈনন্দিন সমস্যাগুলির নিরসনের কোন তাগিদ বা অভিপ্রায় সচারাচর দেখা যেত না। এমনকী অধিকাংশ ক্ষেত্রে তেমন কোন সমস্যা আছে কিনা সে প্রসঙ্গে সচেতনাতাই ছিল দুর্লভ। যে সমস্ত ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে ঔপনিবেশিক শক্তি জড়িত ছিল না, বা বিদেশী শক্তির পাশাপাশি দেশীয় শক্তিরও সামাজিক কোন সমসায় প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল (যেমন কৃষকদের দুর্দশা), সে সমস্ত প্রসঙ্গ রাজনীতির াওতার বাইরে রাখাইশ্রেয় মনে করা হত, স্বাধীনতা সংগ্রামেই রাজনীতির উদ্দেশ্য সীমিত রাখার প্রবণতার কাণ ছিল স্বাধীনতা বলতে শুধু বিদেশী শক্তির নিয়ন্ত্রমুক্তি বোঝা।

গান্ধীর সময় থেকে স্বাধীনতা বলতে ব্যাপকতর এক অর্থ বোঝা শুরু হয়। স্বাধীনাত বলতে গান্ধী বুঝতেন প্রতিটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনে আরোপিত সমস্যার থেকে মুক্তিঙ্গ এই আরোপন বিদেশী শক্তির দ্বারা যতটা হতে পারে, ততটাই স্বদেশী শক্তির দ্বারাও হতে পারে। ভারতবর্ষ সবাধন তখনই হবে যখন এই সমস্যাগুলির ক্ষেত্রে সকলের স্বার্থ সামগ্রিক ভাবে বিবেচিত হবে এবং সমস্যা দূরীকরণের সময় দুর্বল এবং সবল উভয়কেই সমান মর্যাদা দেওয়া হবে। এই পরিবর্তিত বোধের সুবাদে ভারতের সর্বসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারিত হয়। সাধারণ ভারতবাসী উপলব্ধি করেযে স্বাধীন ভারতে তার নিজস্ব গুরুত্ব থাকবে, ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করা একোধারে তার অধিকার এবং কর্তব্য।

রাজনৈতিক সচেতনতার এই হাতিয়ার নিয়ে গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষে শুরু হয় জনমুখী রাজনীতি তথা জন আন্দোলনের যুগ। ক্ষমতার প্রান্তে অবস্থিত সর্বসাধারণ অকস্মাৎ এসে উপস্থিত হয় রাজনীতির প্রাণকেন্দ্রে। এইপরিবর্তনের যুগেই প্রোথিত হয় গণতান্ত্রিক ভারতের বীজ।

২.৩ খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন ১৯২১-২২

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে যে সামাজিক-রাজনৈতিক অসন্তোষ ব্রিটিশ ভারতেদেকা যায় রাওলাট সত্যাগ্রহের পরে তা প্রমানিত হবার কোন লক্ষনই দেখা যায়নি। বরং জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড এবং তার পরে ব্রিটিশ সরকারের কোনরকম অনুতাপের অবাব রাজনৈতিক অসন্তোষের মাত্রা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেন। প্রথম দিকে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পূর্ণ সত্য জানা না গেলেও ধীরে ধীরে তা প্রকাশ পেতে থাকে। ক্রমান্বয়ে ভারতীয় নেতাদের বিমূঢ়তা উষ্মায় পরিণত হয়। রবীন্দ্রনাথ খে গান্ধী, মতিলাল নেহরু থেকে কেলকার সকলেই ব্রিটিশ রাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন।

একই সময়ে ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যঢ় ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে মনোভাব ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছা আগে থেকে ভারতীয় মুসলিমরা ইসলামী দুনিয়ার খলিফা, অটোমান সুলতানের ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। কারণ ইউরোপের বল্কান অঞ্চল থেকে তুরস্ক

শক্তিকে ক্রমশ সরে আসতে হচ্ছিল, যাতে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের প্রত্যক্ষ সমর্থন ছিল। বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তুলস্ক ব্রিটিশ শক্তির বিরোধীতাকে জেহাদ আখা দেওয়ায় ভারতবর্ষের মুসলিমদের একটি বড়গোষ্ঠী ব্রিটিশ শক্তির বিরোধীতা করা শুরু করে। বিশ্ব যুদ্ধে তুরস্কের পরাজয়ের ফলে খলিফার ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। বিশ্বের অন্য বহুদেশের মতই ভারতবর্ষের মুসলিমরাও খলিফার সে। মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহারের দাবি আন্দোলন তীব্র করার কথা ভাবতে থাকে।

১৯১৯-২০ সালে এই উত্তেজক পরিস্থিতিতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং খিলাত আন্দোলনকারীরা একে অপরে দিকে সমর্থনের হাত বাড়ান। কংগ্রেস বুঝেছিল প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনীতির যুগে মুসলিম জনসমর্থন বারতীয় রাজনীতিকে বলিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠা দিতে অপরিহার্য ছিল। খিলাফতিরা বুঝেছিল ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধ বা গণআন্দোলন গড়ে তুলতে তা শুধু মুসলিমসদর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। তাই পারস্পরিক স্বার্থে কংগ্রেস-খিলাফতিদের বৈত্রী স্থাপন হয়, শুরু হয়য ভারতের প্রথম নিয়ন্ত্রত জনআন্দোলন।

২.৩.১. খিলাফত এবং ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়

''খিলাফত'' কথাটির অর্থ 'খলিফা সম্পর্কিত'। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বিপন্ন তুর্কী শক্তি আটোমান সাম্রাজ্যের সর্বত্র মুসলিম আনুগত্য নিশ্চিত করতে নিখিল ইসলামী মতাদর্শের পতন ঘটায়। অটোমান সুলতান সুন্দী মুলসিমদের খলিফা বলে স্বীকৃত হওয়ায় তিনি সমস্ত মুসলিমের ধর্মীয় আনুগত্যের দাবিদার ছিলেন। নিখিল ইসলামীয়তা () তুর্কী সাম্রাজ্যের সীমান্ত পেরিয়ে অন্যান্য দেশেও প্রভাব ফেলেছিল, ভারতীয় উপামহাদেশ ছিল এর অন্যতম নিদর্শন। আলী ভাতৃদ্বয়, মৌলানা আব্দুল বারি, মৌলানা আজাদ প্রভৃতি নেতার রাজনীতিতে প্রবেশ ঘটে এইনিখিল ইসলামী রাজনীতির সূত্রেই।

গেল মিনোল্টোর মত ঐতিহাসিকেরা খিলাফতি আন্দোলনের নিহিত উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। মিনোল্ট মনে করেন খিলাফতিদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের মুসলিম সম্পাদায়ের মধ্যে পাশ্চাত্যমুখী আলিগড়পন্থীদের প্রভাব ঠেকানো এবং উপমহাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে প্রাদেশিকতা এবং সংকীর্ণ স্বার্থের উর্দ্ধে এনে সুসংহত করা। সেক্ষেত্রে এমন কোন বিষয়ের প্রয়োজন ছিল যা ধনী-দরিদ্র, প্রদেশ বা শ্রেণীর উর্দ্ধে উঠে মুসলমানের সত্তাকে সরাসরি আহ্বান করতে পারে। ইসলামীব দুনিয়ার খলিফার মর্যাদাকে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করলে সাধারণ ধর্মনিষ্ঠ মুসলিমদের সমর্থন পাওয়া সম্ভব ছিল, কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষায় বঞ্চিত সাধারণ মুসলিমদের কাছে ধর্ম চিল জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক, তার আত্ম-পরিচয়ের অন্যতম অঙ্গ। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত মুসলিমদের একটি বড় সংখ্যাও আত্ম-পরিচয়ের ক্ষেত্রে ধর্মকে অপরহার্য মনে করতেন। তাই খিলাফত আন্দোলন কেন্দ্র করে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে যতটা সংহতি আনা সম্ভব ছিল, আলিগড়-প্রধন মুসলিম লীগের সংসদীয় রাজনীতিতে তার কণামাত্রও সম্ভব ছিল না।

খিলাফত আন্দোলনের বাহ্যিক এবং নিহিত উদ্দেশ্য পৃথক হলেও দুটি ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ রাজ। ভারতের মুসলিমদের দুর্দশার জন্য রাজের দায় স্মরণে রেখে খিলাফতিরা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম করতে চায়। এই সংগ্রামের সাফল্যের জন্য অ-মুসলিম জনসমর্থন ছিল আবশ্যক। খিলাফতি নেতৃবর্গ তাই শুরু থেকেইবৃহত্তর হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সহাবস্থানের কথা বলে এবং ব্যাপকতর রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত হবার কথা বলে। এই প্রবণত রাওলাট সত্যাগ্রহের সময় গান্ধী-আবন্দুল বারি সমঝোতার মাধ্যমে ত্বরান্বিত হয়।

২.৩.২ গান্ধী, খিলাফত এবং অসহযোগ আন্দোলন

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কিছু নেতা ব্যক্তিগতভাবে খিলাফত আন্দোলনের চেষ্টা করলেও সাময়িকভাবে কংগ্রেস খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে যোগ দেয়াতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। খিলফতিরা চাইছিলেন মন্ম-ফোর্ড আইন অনুসারে গঠিত প্রাদেশিক কাউন্সিলের আসন্ন নির্বাচন বর্জন করতে। কংগ্রেসের বরিষ্ঠ নেতাদের অধিকাংশই কাউন্সিল বর্জনে নারাজ ছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহেরু প্রমুখ চাইছিলেন প্রদেশিক কাউন্সিলে প্রবেশ করে তা অচল করে ব্রিটিশ সরকারকে ব্যাপকতর প্রশাসনিক সংস্কারে বাধ্য করা। অ্যানী বেসান্ত প্রমুখ নেতৃবর্গ মনে করেন বহুকষ্টে অর্জিত অধিকার হেলায় ত্যাগ করা অনুচিত হবে। গান্ধী স্বয়ং প্রথমে মনে করেছিলেন ব্রিটিশদের বাড়ানো হাত গ্রহণ করাই উচিত। কিন্তু উপর্যুপরি দুটি ঘটনা তাঁর মত পরিবর্তন করে। ১৪মে ১৯২০ তারিখে সেভ্রে-এর চুক্তি () অনুসারে তুরস্ক সাম্রাজ্য থেকে আরব অঞ্চলগুলি বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, এবং খলিফার ক্ষমতা হ্রাস করা হয়। এতে ভারতীয় মুসলিমদের উষ্ণ শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছায়। ২৯শে মে ১৯২০ তারিখে হান্টার কমিশনের রিপোর্ট ব্রিটেনের সংসদে পেশ হলে গর্ভনর ও ডায়ারকে নির্দোষ সাব্যস্ত করা হয়, এবংজেনারেল ডায়ারকে লর্ডস সভা ধিক্কার জানাতে অস্বীকার করে।

বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটির এলাহাবাদ অধিবেশনে (১-৩ জুন ১৯২০) বহু জাতীয়দাবাদী হিন্দু নেতাযোগদান করেন। গান্ধী মৌলানা বারির অসহযোগ কার্যক্রম সমর্থন করে খিলাফতিদের মধ্যেকার চরমপন্থী গোষ্ঠীর হাত শক্ত করেন। স্থির হয় ১৯১৯ সালে প্রস্তাবিত দেশ জোড়া হরতাল এবং ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে রাজনৈতিক তথা সামাজিক ক্ষেত্রে সবরকম সহযোগতিা প্রত্যাহারের মাধ্যমে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

গান্ধী মনে করেছিলেন যে হিন্দু-মুসলিম তথা সর্বভারতীয় ঐক্যসাধনের পর থেকে অনুকূল পরিবেশ পাওয়া যাবেনা। খিলাফত ভারতীয় মুসলিমের আত্ম-পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকাতে, সেই বিষয়ে ভারতের হিন্দুরা নিঃশর্তে তাদের পাশে দাঁড়ালে সাম্প্রদায়িক বিভেদের উর্দ্ধেল উঠে ঐক্য গড়ে তোলা যাবে। তদুপরি পাঞ্জাবে ব্রিটিশ অত্যাচারে হিন্দু-মুসলিম সমান ভাবে নীড়নের শিকার হওয়াতে ঐক্যসাধনের জন্য আবশ্যক ''শত্রুপক্ষ'' ও উপস্থিত ছিল—ব্রিটিশ সরকার। ফলে গান্ধী কংগ্রেসের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন যাতে ''খিলাফত অন্যায়'' এবং ''পাঞ্জাব অন্যায়''-এর বিরুদ্ধে খিলাফতিদের সঙ্গে কংগ্রেস হাত মিলিয়ে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে।

কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটি এলাহাবাদে চার স্তরে অসহযোগের ডাকদেয়। ব্রিটিশ খেতাব, উপাধি, বর্জন, সরকারী সংস্থা, পুলিশ এবং সেনাবাহিনী বয়কট, অর্থনৈতিক অসহযোগ (রাজস্ব দেওয়া থেকে বিরত থাকা) এবংপ্রাদেশিক কাউন্সিল বর্জন। কংগ্রেস নেতৃত্বের একটি বড় অংশ এতে ব্যাপক আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছিলেন। চিত্তরঞ্জন এবং মতিলাল নেহেরু সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণতন বয়কট করার বিরুদ্ধে চিলেন কারণ বিকল্প ব্যবস্থা কিছু ছিলনৈ না। কাউন্সিল বর্জনের প্রশ্নটিই অবশ্য সব থেকে বড় প্রতিপন্ন হয়। বম্বে এবং বাংলায় নভেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কংগ্রেসের সম্ভবনা উজ্জ্বল হওয়ায় এঁরা কাউন্সি বর্জন করতে চাননি। কিন্তু পাঞ্জাবে তেমন অবস্থা না হওয়ায় লাজপত রায় বর্জনের পক্ষে ছিলেন। বেসান্তের বিরোধীগোষ্ঠীর সক্রিয়তায় মাদ্রাজ এবং বম্বের নেতৃত্বও ক্রমশ

বেসান্তের বিরুদ্ধাচারণ করার উদ্দেশ্যে বর্জনের পক্ষে চলে যায়। সেপ্টেম্বরে উত্তর প্রদেশের পরিস্থিতি দেখে মহিলালও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়াতে ডিসেম্বরে কংগ্রেসের নাগপুরে বার্ষিক অধিবেশনে আপসের রফা স্থির হয়। গান্ধী মনে নেন যে আন্দোলনের লক্ষ্য স্বরাজ হলেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে যোগ ছিন্ন করা হবেনা। স্কুল,আদালত বয়কটের পাশাপাশি বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে এবং বিদেশী পণ্যদ্রব্য বয়কট করতে হবে (বণিক স্বার্থ অস্বীকার করে)। বিনিময়ে দাশ কাউন্সিল বর্জন মেনে নেন। গান্ধী একবছরের মধ্যে স্বরাজ আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার আহ্বান জানান।

নাগপুর অধিবেশনেই কংগ্রেসকে প্রাতিষ্ঠানিক ধাঁচ ঢেলেসাজানো হয় গান্ধীর কথানুসারে। ন্যূনতম সদস্য চাঁদা ৪ আনা ধার্য করা হয়, গ্রাম-তালুকা-জেলা বা শহর কমিটিকে ক্রমানুসারে সাজিয়ে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশিক কমিটি গঠন করে তার অধীনে আনা হয়। প্রাদেশিক নেতৃত্বের সঙ্গে সর্বভারতীয় নেতৃত্বের যোগ হিসেবে ১৫ সদস্যের কার্যনির্বাহী কমিটি এবং সর্বভারতীয় কংগ্রেসে কমিটি সৃষ্টি হয়, যাতে জনসংখ্যারে অনুপাতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে। এইসাংগঠনিক পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে কংগ্রেস ভারতবর্ষের প্রতিটি অঞ্চলে শাখা-সংগঠনের মাধ্যমে হাজির হতে সফল হয়, এবংজনমুখী রাজনীতির জন্য উপযোগী হয়ে ওঠে।

২.৩.৩ অসহযোগ আন্দোলনের ধারা এবং প্রকৃতি

অসহযোগ আন্দোলন চারটি পর্যায়ে দানা বাঁধে। ডিসেম্বর ১৯২০ থেকে মার্চ ১৯২১ অবধি চলে প্রথম পর্যায়। এই পর্বে ভারতীয়রা বিভিন্ন ব্রিটিশ পরিচালিতৈ সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠান বর্জন করে,যেমন আদালতৈ, সরকারি বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়, এছাড়া ভারতীয়রা ব্রিটিশ সরকারের দেয়া খেতাব, উপাধি ইত্যাদি বর্জন করতেশুরু করেন। মার্চ-জুলাই ১৯২১ ছিল আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব—এ পর্যায়ে কংগ্রেসে এক কোটি সদস্যভুক্তি এবং তিলক স্বরাজ তহবিলে এক কোটি টাকা তোলার উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী প্রচেষ্টা চলে। জুলাই থেকে অশোবর ১৯২১—অর্থাৎ আন্দোলনের তৃতীয় পর্বে আন্দোলন ক্রমশ কট্টপন্থার দিকে ঝুঁকতে থাকে। শুরু হয় বিলিতি দ্রব্য বর্জন। নভেম্বর ১৯২১ থেকে ফেব্রুয়ারী ১৯২২ অর্থাৎ শেষ পর্বে রাজশক্তির দমনমূলক নীতির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আন্দোলন করমশ সহিংস হবার প্রবণতা দেখাতে থাকে,অর্থাৎ গান্ধীর নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে আসে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই গান্ধী আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্বে সরকারি প্রতিষ্ঠান বর্জনের উদ্যোগ সর্বক্ষেত্রে সমান সাফল্য পায়নি। সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গেযুক্ত প্রতিষ্ঠিত আইনজীবি—যেমন চিত্তরঞ্জন, মোতিলাল নেহরুর মত ব্যক্তিরা আদালত বর্জন করতে থাকেন, বিকল্প বিচার ব্যবস্থার অনুপস্থিতে সকলে তাঁদের অনুসরণ করতে সাহস পাননি। তুলনায় সাময়িকভাবে অনেক বেশি সফল হয়েছিল ছাত্র আন্দোলন। সরকারের অনুগ্রহলব্ধ আলিগড় মহাবিদ্যালয়ে গান্ধী চাত্র অসহযোগের যে থারা শুরু করেন তাতে কালক্রমে লাহোরের ইসলামী মহাবিদ্যালয়, কলকাতা মাদ্রাসা প্রভৃতি সরকারি বা সরকার সমর্থিত প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে বেরিয়ে আসে। এঁদের জন্য বিকল্প প্রতিষ্ঠান হিসাবে ২০ অশোবর ১৯২০ তারিখে প্রতিষ্ঠা হয় স্বাধীন মুসলিম জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (পরবর্তীকালের জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া)

। কলকাতায় মৌলানা আজাদ স্থাপন করেন মাদ্রাসা-ই-ইসলামিয়া। হিন্দু প্রধান মেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় বয়কটকারী ছাত্রীদের নিয়ে ফেব্রুয়ারী ১৯২১-এ স্থাপিত হয় স্বদেশী প্রতিষ্ঠান কাশী সংস্কৃত বিশবিদ্যালয়। আমেদাবোদ গান্ধী স্বয়ং প্রতিষ্ঠা করেন গুজরাত মহাবিদ্যালয়। এই কার্যবিধির মাধ্যমে কংগ্রেসী রাজনীতির সে। ছাত্র আন্দোলনের যে যোগ স্থাপিত হয় তা পরবর্তী আন্দোলনগুলির সময়েও বিশাল ভূমিকা নিয়েছিল।

মূলত যুব সম্প্রদায়কে ঘিরে স্বেচ্ছাসেবী আন্দোলন গড়ে ওঠে এইসময়। শিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে যৌথ উদ্দেশ্য এবং অসহযোগ কার্যক্রম নিয়ে রাজনৈতিক সচেতনাতা বাড়ার অন্যতম কারণ এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি। মূলত এদেরই উদ্যোগে ছাত্র- আন্দোলন এত ব্যাপক হয়ে ওঠে, কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা শতগুণ বেড়ে যায় এবং তিলক স্বরাজ্য তহবিলে আন্দোলন চালু রাখার মত অর্থ তোলা সম্ভব হয়।আন্দোলনের তৃতীয় পর্বে, ব্রিটিশ রাজকুমার, প্রিন্স অফ ওয়েলেন ভারত ভ্রমণে এলে সর্বত্র প্রতিবাদ সভা করার এবং পরে অর্থনৈতিক বয়কটের সময়ে ক্রেতাদের বিলিতি পণ্য কেনা থেকে বিরত করার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবকরা অগ্রণী ভূমিক নেয়।

অসহযোগ আন্দোলন ভারতবর্ষের সর্বত্র সমান সাড়া ফেলেনি। আন্দোলনের সামাজিক চরিত্র এবং তীবতা বিভিন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম ছিল। অসহযোগ আন্দোলন মূলত নগরাঞ্চলে তীব্রতম আকার নিয়েছিল, কারণ যুক্তপ্রদেশ (বর্তমান উত্তর প্রদেশ)বাদ দিলে কোথাও কৃষক আন্দোলন এই সময়ে প্রবল আকার ধারণ করেনি। সবথেকে শৃঙ্খলাবদ্ধ আন্দোলন দেখা গিয়েছিল গুজরাত এবং বিহারে। যেখানে আন্দোলন অত্যন্ত সচেতনভাবে গান্ধীর অহিংস পন্থা অবলম্বন করেছিল। মহারাষ্ট্রে তিলকের অনুগামীদের সংখ্যাধিক্যেরতরুণ অসহযোগ আন্দোলন তেমন প্রবল নাহওে বম্বে শহরে হিন্দু-মসিলিম শ্রমিক ঐক্য অর্থনৈতিক বয়কটের পর্যায়ে ব্রিটিশ রাজের অর্থনীতিকে প্রায় পঙ্গু করে দেয়। প্রিন্স অফ্ ওয়েলসের ভারত ভ্রমণকে কেন্দ্র করে বম্বেতে রাজনৈতিক বিরোধীতা এক নতুন মাত্রা পায়। এই পর্যায়ে, অর্থাৎ ১৯২১ মাঝামাঝি সময় থেকে অর্থনৈতিক বয়কট শুরু হওয়াতে আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে বণিক শ্রেণী ব্রিটিশদ্রব্য বয়কটের বিপক্ষে থাকলে পাউন্ডের বিনিময় মূল্য হ্রাস হবার ফলে পূর্ববৎ শতানুসারে আমদানী লাভজনক সাব্যস্ত হয়নি। বিনিময় মূল্য পরিবর্তনে ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা নারাজ হওয়াতে ভারতের আমদানীকারী গোষ্ঠী অসহযোগী আন্দোলনে যোগ দেয়াতে স্বদেশী শিল্প ব্যাপক লাভবান হয়। দক্ষিণ ভারতে একমাত্র কর্ণাটক অঞ্চল বাদ দিলে প্রায় সর্বত্রই অসহযোগ আন্দোলন ব্যাপক সফল হয়েছিল, কিন্তু এ প্রান্তে গান্ধীর অহিংসার সাফল্য সত্ত্বেও তার প্রকাশ ঘটে মূলত জাত-পাত ভিত্তিক আন্দোলনের (যেমন নাদর আন্দোলন, মদ্যপান বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি) মাধ্যমে, পাঞ্জাবে শিখ ধর্মের পীঠস্তাগুলি ব্রিটিশ অনুগ্রহপ্রাপ্ত মহন্তদের হাত থেকে কেড়ে নেবীর উদ্দেশ্যে আকালি আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলনকে সাফল্য এনেদেয়। যুক্তপ্রদেশে নগরাঞ্চলে কংগ্রেস-খিলাফত যৌথ সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে কংগ্রেস কর্মীরা যুক্তপ্রদেশের কিষাণ সভা আন্দোলনে যোগদান করলে ১৯২১-এর শেস লগ্নে যুক্তপ্রদেশে অসহযোগ আন্দোলন ক্রমে হিংসার দিকে এগোতে থাকে।

বাংলায় অসহযোগ আন্দোলন প্রথম পর্বের সময়। প্রিন্স অফ ওয়েলসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ ডাকা ১৭ই নভেম্বর হরতাল সর্বাত্মক সাড়া পায়। কংগ্রেস খিলাফতিদের ঐক্যের ফলে পাট এবং

নীলচাষের সঙ্গে যুক্ত কৃষকেরা ব্রিটিশ খামারে চাষ করতে অস্বীকার করে। গ্রামীণ শাসন ব্যবস্থা পরিচালনাকারী ইউনিয়ন বোর্ড নতুন করে চাপালে ১৯২১ সালে ইউনিয়ন বোর্ড বয়কটের সূত্রপাত হয়। এইআন্দোলন তীব্রতম অকার ধারণ করে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমায়। এই অঞ্চলে ক্রমশ সরকারকে দেয় রাজস্বের পাশাপাশি জমিদারকে দেয় খাজনার বিরুদ্ধেও সচেতনাতা বাড়তে থাকে। সাঁওতাল প্রধান অঞ্চলগুলিতে এবং রাজশাহী, ময়মনসিংহ, বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলে াদিবাসী তথা কৃষক সম্প্রদায় বিদ্রোহের পথে এগোতে থাকে। যেমনটা একই সময়ে অন্ধ্র অঞ্চলেও দেকা যাচ্ছিল। বাংলায় শ্রমিক আন্দোলনও তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছিল। ১৯২১ সালে একলক্ষ সাতাশি হাজারের বেশী শ্রমিক ১৩৭টি ভিন্ন ধর্মঘটে যোগ দেয়।

২.৩.৪ আন্দোলন প্রত্যাহার

অসহযোগ আন্দোলন দেশজোড়া যে আবেগের জোয়ার এনেছিল,গান্ধর তার সবদিক সমর্থন করতে পারেননি। কৃষক এবং শ্রমিক অসন্তোষক্রমশ তাঁর মধ্যে হতাশা জাগিয়ে তুলছিল। মালাবার অঞ্চলে হিন্দু জেনমি ভূস্বামী এবং মহাজনদের বিরুদ্ধে মুসলিম মোপলাদের সংগ্রাম যখননৃশংস হত্যা এবৰ বলপূর্বক ধর্মান্তরের রূপ নেয়, গান্ধী তখনইশঙ্কিত হন। বাংবার বিভিন্নঅঞ্চলে হিংসার প্রকোপ দেখে গান্ধী অন্তত দুবার বারদৌলি অঞ্চলে সত্যাগ্রহ পিছিয়ে দেন।বারদৌলি সত্যাগ্র ছিল মূলত গ্রামীণ সমাজে আইনঅমান্য আন্দোলনের প্রকল্প। অর্থাৎ ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে নিয়ন্ত্রিত জনআন্দোলন নিয়ে যাবার প্রথম ধাপ। কিন্তু গান্ধী ক্রমশ অনিশ্চিত হয়ে উঠছিলেন যে গ্রামীন ভারতবর্ষেঅহিংস সত্যাগ্রহের পরিস্থিতি রয়েছে কিনা।

এমন পরিস্থিতিতে শোনা গেল ৬ইফেব্রুয়ারী ১৯২২ তারিখে গোরক্ষপুরের চৌরিচৌরায় জনতা ২২ জনপুলিশকে থানায় জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছে। যদিও ব্রিটিশ দমননীতির উচ্চাঙ্গে যাবার ধারা অব্যাহত রেখে চৌরিচৌরায় জনতার প্রতিযথেষ্ট প্ররোচনামূলক আচরণ পুলিশ করেছিল, তবু গান্ধী জনতার দোষ স্খলনের চেষ্টা না করে বারদৌলিতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনডেকেআন্দোলনের যবনিকা টেনে দিলেন। গণ সতাগ্রহের পরিবর্তে গঠনমূলক কার্যকলাপে সঙ্কল্পনেয় কংগ্রেস।

কংগ্রেসএবং খিলাফতিদের শীর্ষ নেতারা প্রায় সকলেই ব্রিটিশ দমননীতির শিকার হয়ে কারারুদ্ধ। কারান্তরাল থেকেই চিত্তরঞ্জন, মতিলাল, জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র, আলি ভাতৃদ্বয়—সকলেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। সুভাষ এবং জওহরলাল মনে করেছিলেন আন্দোলন যখন তীব্র হয়ে উঠছে তখন প্রত্যাহার করে নেয়া সমীচিন হয়নি। একই মত পেষণ করেছিলেন কট্টপন্থী খিলাফতিরা। চিত্তরঞ্জন এবং মতিলালের আপত্তির কারণ ছিল অন্য। তাঁরা চেয়েছিলেন প্রিন্স অফ্ ওয়েলসের আগমন উপলক্ষ্যে বড়লাট রিডিং যখন আন্দোলন স্থগিত রেখেশাসন সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তখনই তামেনে নিন। গান্ধী তখন এইদাবি নস্যাৎ করে দেন। তার তিন মাসবাদে গান্ধী যখন আন্দোলন প্রত্যাহার করেন তখন রিডিং-এর প্রস্তাব আর বিবেচ্য ছিল না।

গান্ধীর যুক্তি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনিদেখতে পাচ্ছিলেন যে আন্দোলনের অহিংস চরিত্র ক্রমশবদলে যাচ্ছিল। বিশেষত,উত্তেজক বক্তব্য রাখার দরুণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিপন্ন হবার আশঙ্কায় ১৯২১ সালে তিনি মৌলানা মহম্মদ আলিকে ক্ষমা চাইতে জোর দেয়ায় তাঁর সঙ্গে খিলাফতিদের দূরত্ব বাড়তে

থাকে। তিনি বুঝতে পারেন যে খিলাফতিরা প্রয়োজনে সহিংসআন্দোলন করতেও প্রস্তুত।এর ওপরে কৃষক এবং শ্রমিক আন্দোলন হিংসার পথে নামলে গণআন্দোলকে অহিংস রাখা যাবে না। সেক্ষেত্রে ব্রিটিশ দমননীতি নৈতিক বৈধতা পেয়ে যাবে, এবং জন আন্দোলনকে মেশীবলে চূর্ণ করা কসম্ভব হবে। এ সমস্ত কারণে গান্ধী ১৯২২ সালে অসেহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেন।

২.৪. আইন অমান্য আন্দোলন

ভারতে জনমুখী রাজনীতি তথা জন-আন্দোলনের যুগের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য পর্যায় ছিল ১৯৩০-৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলন। এই আন্দোলন রাজনৈতিক দিক তেকে অসহযোগ আন্দোলনের স্বাভাবিক পরিণতি। অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটশ ীরাজের থেকে সহযোগিতার হাত সরিয়ে নিয়ে রাজের দুর্বলতা এবং প্রজাতের ওপর নির্ভরশীলতা বুঝিয়ে দেয়া। আইন অমান্য আন্দোলন ব্রিটিশ শাসনের নৈতিক অধিকারকে অস্বীকার করে ভারতীয়দের স্বায়ত্বশাসননের দাবি প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে সংগঠিত হয়েছিল। এর মূল বক্তব্য ছিল ব্রিটিশ রাজের ভারত শাসনরে কোন নৈতিক অধিকার না থাকায় ব্রিটিশ আইন না মানাই প্রতিটি ভারতবাসীর কর্তব্য।

২.৪.১ প্রেক্ষাপট ঃ ভারতীয় রাজনীতি ১৯২২-২৯

অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের পর কংগ্রেস ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। কারারুদ্ধ হবার আগে গান্ধী কংগ্রেসকে ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে গঠনমূলক কাজে লিপ্ত হতে বলেন, তাঁর এই মত সমর্থন করেন রাজাগোপালাচারী, প্যাটেল প্রমুখ নির্বাচন-বিরোধী () নেতারা, অব্যদিকে চিত্তরঞ্জন, মতিলাল এবং হাকিম অজমল খাঁ প্রমুখ নির্বাচন পন্থীরা () চাইছিলেন কংগ্রেস পরবর্তী প্রাদেশিক কাউন্সিল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এগুলি অচল করে দিক যাতে সরকার সংস্কারে বাধ্য হয়। গয়ায় ১৯২২ সালের বার্ষিক অধিবেশনে নির্বাচনপন্থীরা পরাজিত হলে সভাপতি চিত্তরঞ্জন পদত্যাগ করে ১৯২৩ সালের ১লা জানুয়ারী মতিলালের সঙ্গে স্বরাজ্য পার্টি স্থাপন করেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও গান্ধী চিত্তরঞ্জনের অবস্থানকে মর্যাদা দিয়ে নির্বাচন-বিরোধী এবং নির্বাচন-পন্থী—উভয় নীতিকে কংগ্রেসের কার্যক্রমের অঙ্গ বলাতে কংগ্রেস বড় বিভাজন এড়াতে পারে।

১৯২৩-২৬ সালে স্বরাজ্য পার্টি বাৎলা এবং যুক্তপ্রদেশে ভাল ফল করে কাউন্সি ভেতর থেকে অকেজো করার যে পরিকল্পনা নিয়েছিল তাতে আংশিক সাফল্য আসে। সাফল্য আংশিক চিল কারণ স্বরাজ্য পার্টির ধারণা ছিল কাউন্সি অচল হলে সরকার আপসের কথা বলবে। কিন্তু যুদ্ধোত্তর উত্তেজনা প্রশমিত হওয়ায় ব্রিটিশ রাজের ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ইচ্ছা ক্রমশ দূরীভূত হয়। ফলে ধীরে ধীরে শক্তিক্ষয়ের পর ১৯২৬ সালে চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পরে স্বরাজ্য পার্টি আবার কংগ্রেসি মূলস্রোতে ফিরে আসে।

ওই সময়েই গান্ধর ও তাঁর অনুগামী কংগ্রেসিরা দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গঠনমূলক কাজে মগ্ন হন। প্রাকৃতিক দুর্যোগাক্রান্ত অঞ্চলে ত্রাণ পৌঁছানো থেকে আরম্ভ করে গ্রামে গ্রামে শিক্ষাব্যবস্থা, স্বাস্থ্য-

বিষয়ক সহায়তা ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক জাক করে কংগ্রেসের সাংগঠনিক ভিত মজবুত হহয়। রাজনীতিতে জনগণের গুরুত্ব সকলের অগোচরে রাজনীতির ব্যাকারণে ঢুকিয়ে গান্ধীর কংগ্রেস হয়ে ওঠে প্রকৃত অর্থে জনমুখী এবং জনপ্রিয়।

ইতোমধ্যে তুরস্কে তুর্কী শাসক দ্বারা খলিফা পদের অবসান ঘটানো হলে ভারতে খিলাফত আন্দোলন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। বিশের দশকের মাঝামাঝি অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিস্থিতির দরুণ হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে অবনতি হয়। ১৯২৪ সালে উত্তর-পশ্চি সীমান্ত প্রদেশে এক দাঙ্গায় ১৫৫ জন নিহত হয়। ১৯২৬ সালে কলকাতায় তিনটি দাঙ্গায় ১৩৮ জনের মৃত্যু হয়। ঢাকা, পাটনা, রাওয়ালপিণ্ডি এবং যুক্ত প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় ১৯২৩ থেকে ১৯২৭ -এর মধ্যে শতাধিকা দাঙ্গা হয়। এর কারণ মূলত আর্য-সমাজের ''শুদ্ধি'' এবং ''সংগঠন'' নামক দুটি প্ররোচনামূলক আন্দোলন। ঘোর বদলা হিসেবে মুসলিম মৌলবৌদী শুরু করে ''তনজিম'' এবং 'তবলিখ'' আন্দোলন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিন্দু-মেলবাদী এবং হিন্তু জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ (যেমন লাজটপত রায়, মালব্য, যুঞ্জে) কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে কংগ্রেসের প্রতি মুসলিম বিরাগ বাড়তে তাকে।

মন্ট-পোর্ড আইনে প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা কতটা সফল তা খতিয়ে দেখার জন্য একটি কমিশনের নিযুক্ত মন্ট-ফোর্ড আইননেই বলা ছিল। ১৯২৭ সালে সেই অনুসারে সাইমন কমিশন পাঠানো হয় ভারতবর্ষে। ব্রিটিশ সরকারের অনুমান ছিল সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বে দীর্ণ ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ঐক্যর অভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর বা বিকেন্দ্রীকরণ কোনটাই আদায় করে নেবার মত অবস্থায় ভারতীয়রা নেই—ফলে কমিশনের সব সদস্যই শেতাঙ্গ হলে তা নিয়ে বিরোধীতা তারা াশা করেনি।

কিন্তু ভারতের ভবিষ্যত নিয়ে পর্যালোচানর ভারপ্রাপ্ত কমিশনে কোন ভারতীয় সদস্য না থাকা ভারতের রাজনীতিবিদ্দের কাছে চরম অপমান বলে মনে হয়। দেশজুড়ে সাইমন কমিশন বয়কটের সিদ্ধান্তে সব রাজনৈতিক দল ঐক্যমত হয় (ব্যতিক্রম পাঞ্জাবের ইউিনিয়নিস্ট পার্টি এবং মাদ্রাজে জাস্টিস পাটি)। জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ এবং তেনবাহাদুর সাপ্রুর অধীনে লিবারেল কনফেডারেশন কংগ্রেসের সঙ্গে একজোট হয়ে সর্বদলীয় সম্মেলন আহ্বান করে। জিন্না মুসলিম লীগের কট্টরপন্থী মুসলিমদের জন্য সর্বভারতীয় আইনসভায় ১/৩ আসন সংরক্ষিত থাকবে এবং সিন্ধু, বালুচিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পৃথক রাজন্য হিসাবে গঠিত হবে। দিল্লীতে সর্বদলীয় সম্মেলনের প্রথম বৈঠকে (ফেব্রুয়ারী ১৯২৮) এই শর্ত স্বীকৃত লে পূর্ণ উদ্যমে ভারতয়য রাজনীতিবিদরা (মূলত মতিলাল নেহরু এবং সাপ্রু) স্বায়ত্ব শাসিত ভারতের সংবিধান প্রণয়নের চেষ্টা করতে থাকেন। এই সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সরকারকে দেখিয়ে দেওয়া যে ভারতীয়রা ঐক্যবদ্ধভাবে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান করতে পারে। কিন্তু আগস্ট মাসে সর্বদলীয় সম্মেলনের লক্ষ্নৌ অধিবেশনে হিন্দুত্ববাদী কেলকার, মালব্য প্রভৃতির চাপে নেহরু যে রিপোট পেশ করা হয় তাতে জিন্নার দাবীসমূহের প্রায় কিছুই স্বীকৃতি পায়নি। ফলে পরবর্তীকালে জিন্না কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ সম্পূর্ণ ইচন্ন করে লীগে আত্মনিয়োগ করেন।

সাইমন কমিশনের ভারতসফর জনিত উত্তেজনা এবং নেহরু রিপোর্ট জনিত উৎসাহ ছাড়াও

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে গতিসঞ্চারের অন্য কারণ ছিল। বিশ্বজনীন যে অর্থনৈতিক মন্দা ১৯২৯-এ প্রকট হয়েছিল, ১৯২৮ সাল থেকেই তার পূর্বাভাস দেখা যাচ্ছিল। কৃষিপণ্যের মূল্যহ্রাসের ফলে কৃষক শ্রেণী চরম দুর্দশার শিকার হতে থাকে ১৯২৬ সালের শেষ থেকে। ওই সবয় থেকেই শ্রমি অসন্তোষও বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সদ্য প্রতিষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (১৯২৬) এবং অন্যান্য বামপন্থী শক্তি শ্রমিক অসন্তোসেণ সৃষ্টি করতে থাকে। তাদের চরমপন্থী দাবির প্রতিফল হিসাবে সমাজতন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে যোগ ছিন্ন করার দাবি ওঠে। সব্র উত্তর ভারতে সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী সংগঠন দেকা দেয় (যেমন হিন্দুস্তার রিপাব্লিকান অ্যাসোসিয়েশন, যার পরে নাম হয় হিন্দুস্তান সোস্যালিস্ট রিপাব্লিকান আর্মি—যার অন্যতম নেতা ভগৎ সিং)। ১৯২৮ সালের কলকাতা অধিবেশনে বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনের সমর্থনে কংগ্রেসের যুব নেতৃবর্গ (যেমন সুভাষ এবং জওহরলাল) কংগ্রেসের অভীষ্ট পরিবর্তনের দাবি জানান। তাঁদের দাবি ছিল নিছক স্বায়ত্বশাসনের (Dominion Status) পরিবর্তে কংগ্রেস পূর্ণস্বরাজের লক্ষ্যে পরিচালিত হোক। কংগ্রেসের রক্ষণশীল গোষ্ঠী এতে নারাজ হওয়াতে গান্ধী সমঝোতা সূত্র আনেন। তিনি বলেন, পরবর্তী এক বছরের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার ভারতকে স্বায়ত্বশাসন না দিলে কংগ্রেস পূর্ণস্বরাজকে তাদের অভীষ্ট বলে স্থির করবে।

ওদিকে ব্রিটেনে ক্ষমতাসীন লেবার সরকার সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলনেী তীব্রতা দেখে ঘোষণা করে যে স্বায়ত্বশাসন প্রদান করাই লন্ডনের উদ্দেশ্য, এবং তা সাইমন কমিশনের রিপোর্ট এলেই বিবেচিত হতে পারে। সরকার একটি গোলটেবিল বৈঠকেরও প্রস্তাব দেয় ১৯২৯ সালে। গান্ধী, মতিলাল এবং মালব্য এই প্রস্তাব প্রাথমিকভাবে মেনে নিয়ে শর্ত রাখেন যে কংগ্রেসকে সংখ্যাগষ্ঠের মর্যলাদা দিতে হবে, এবং আলোচনা হতে পারে স্বায়ত্বশাসন কবে কীভাবে দেয়া হবে সেই নিয়ে, দেখা হবে কিনা তা নিয়ে নয়। বড়লাট আরউইন এই শর্ত মানতে অস্বীকার করায় ডিসেম্বর ১৯২৯-এ আলোচনা ভেস্তে যায়। ১৯২৯ সালে লাহোর অধিবেশনে সবাপতি জওহরলাল তাই দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণঅ করেন কংগ্রেসের পরিবর্তিত লক্ষ্য—পূর্ণ স্বরাজ।

২.৪.২ আন্দোলনের ধারা এবং প্রকৃতি

লাহোর অধিবেশনের পরের দু-মাস ভারতবাসী গান্ধীর দিকে তাকিয়ে ছিল, কখন কীভবে গণআন্দোলনের পরের ধাপ শুরু হবে সে সম্বন্ধিত ইঙ্গিতের আশায়। ২৬শে জানুয়ারি ১৯৩০ কংগ্রেসের উদ্যোগে সর্বত্র স্বাধীনতার শপথ নিয়ে বলা হয় ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক দুর্গতির জন্য দায়ী ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। দেশ জুড়ে বিদেশী করকার প্রণীত আইন অমান্য করা এমন কী খাজনা দেয়া তেকে বিরত থেকে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে আহ্বান জানানো হয়। ৬ই জানুয়ারী কংগ্রেসী মন্ত্রীদের প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করতে বলা হয়। ৩১শে জানুয়ারী গান্ধী বড়লাট আরউইনকে ১১-দফা দাবি পেশ করেন। এর মধ্যে কিছু দাবি সাধারণ হলেও (যেমন সামরিক খরচ এবং সরকারী কর্মচারীদের বেতনে ৫০% হ্রাস; রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি ইত্যাদি) তিনটি দাবি ছিল মন্ত্রাক্রান্ত বুর্জোয়া স্বার্থ স্মরণে রেখে (টাকা-পাউন্ডের বিনিময় মূল্য পরিবর্তন, ভারতীয় সুতিশিল্পকে সরকারি সুরক্ষা এবং উপকূলবর্তী নৌচলাচলে ভারতীয়

উদ্যোগকে নিরাপত্ত)। এছাড়া দুটি মূলত কৃষক-সম্পর্কিত দাবিও (ভূমি রাজস্বে ৫০% হ্রাস এবং সরকারের লবন কেনা বেচায় একচেটিয়া অধিকার তথা লবন কর বাতিল করা) রাখা হয়। এই দাবিগুলি পত্রপাঠ নস্যাৎ করে দেয়াতে গান্ধী লবন সত্যাগ্রহের ডাক দেন।

১৯৩০-এর অর্থনৈতিক মন্দার পরিপ্রেক্ষিতে গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপট তৈরি ছিল ঠিকই, কিন্তু এমন কোন একটা বিষয় ছিল না যা কেন্দ্র করে সারা দেশে সমান সাড়া পাওয়া যেতে পারত। গান্ধী যখন আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করতে বলন-আইন ভাঙতে চান তখন অনেকে এর তাৎপর্য বুঝতে পারেনি। লবন আইন অনুসারে সরকারের অনুমতি ছাড়া এবং সরকারের কর নিয়ে নুন প্রস্তু করা আইন বিরুদ্ধ ছিল। গান্ধী এই আইনকে কেন্দ্র করে ভারতবাসীকে বোজাতে চান নুনের মত প্রাত্যহিক ব্যবহারের সামান্যতম দ্রব্য থেকে অর্থনীতির প্রতি স্তরে ব্রিটিশ শাসকেরা বারতবর্ষকে শোষণ করে চলেছে। লবন আইন ভঙ্গ করে গান্ধী ভারতের ব্রিটিশ শাসনের এই সর্বগ্রাসী শাসনযন্ত্রের শাসনের নৈতিক অধিকারকেই অস্বীকার করতে চান। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি সাবরমতী আশ্রম থেকে ডান্ডী অভিমুখে যাত্রা করেন (১২ মার্চ—৬ এপ্রিল, ১৯৩০) এবং ডান্ডীতে লবন আইন ভেঙে কারাবরণ করেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে অহিংসভাবে সবরকম আইন অমান্য করার অহ্বান দেওয়াতে এই আন্দোলন শুরু থেকেই তীব্রতা লাভ করেছিল।

গান্ধীর শান্তিপূর্ণভাবে সবরকম আইন অমান্যের আহ্বানের কারণ ছিল উপকূলবর্তী অঞ্চল ছাড়া লবন আইন অপ্রাসঙ্গিক ছিল। তাই গান্ধীর এই আহ্বানের মূল উদ্দেশ্য চিল আঞ্চলিক সমস্যাগুলির বিরুদ্ধে আঞ্চলিক প্রতিবাদগুলিকে সুসংহত সর্বভারতীয় আন্দোলনের সঙ্গে জুড়ে দেয়া। তাই এই আন্দোলনের আঞ্চলিক তথা গোষ্ঠীস্বার্থ অনেক বেশি প্রকট হয়ে উঠেছিল।

গান্ধীর রাজনীতির দুর্গ বিহার এবং গুজরাতে অঅইন অমান্য আন্দোলন বরাবরের মতই নিয়ন্ত্রিত ছিল। কংগ্রেসি ভূস্বামী সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে সরকারকে রাজস্ব দেয়া বন্ধ করা হলেও জমিদারদের দেয় খাজনার বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন দেখা যাডয়নি। মম্বে এবং গুজরাতের বণিক এবং শিল্পপতিরা সীরকারি আর্থিক তথা শিল্পনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে এঁরা একজোট হয়ে কংগ্রেসের অর্থনৈতিক প্রকল্পে সমর্থন যোগন—বিলিতি পণ্য বর্জন করে, বহ্ন্যুৎসবে যোগ দিয়ে এঁরা এঁদের অনমনীয়তার পরিচয় দেন।

শান্তিপূর্ণ আইন অমান্যের মাধ্যমে কারাবরণ করে ব্রিটিশ শাসনযন্ত্রকে নিস্ক্রিয় করে দেবার গান্ধীবাদী প্রকল্প বম্বে এবং গুজরাত বাদ দিলে সবথেকে বেশি সফল হয় বাংলায়। কিন্তু প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে এর থেকে বেশি কিছু সাফল্য বাংলার নগরাঞ্চছচলে দেখা যায়নি।

কর্ণাটক এবং মধ্যপ্রদেশে আইন অমান্য আন্দোলন প্রবল আকার নেয় মূলত আদিবাসী এলাকায় জঙ্গল সংক্রান্ত আইন ঘিরে। শুধু বেরার অঞ্চলেই ১০৬টি সত্যাগ্রহ হয়েছিল জঙ্গল সংক্রান্ত আইন নিয়ে। তামিলনাড়ু এবং মালাবার অঞ্চলে সত্যাগ্রহ তুঙ্গে ওঠে মাদক বর্জন আন্দোলনকে কেন্দ্র করে, যার সুবাদে অজস্র মদের দোকানের সামনে পিকেটিং করা হয়।

যুক্তপ্রদেশে আইন অমান্য আন্দোলন দুটি ভাগে ভাঙা যায়। আওয়াধের তালুকদারের ব্রিটিশরাজের

প্রতি অনুগত থাকতে সেখানে কংগ্রেসের নেতৃত্বে কিষাণ সভা আন্দোলনে সরকারকে রাজস্ব এবং জমিদারকে খাজনা দেয়া থেকে কৃষককে বিরত করা হয় নেহরুর নেতৃত্বে। কিন্তু আগ্রা অঞ্চলের জাতীয়তাবাদী ভূস্বামীদের দেয় খাজনা থেকে সেখানকার কৃষকেরা অব্যাহতি পায়নি।

অসহযোগ আন্দোলনের থেকে আইন অমান্য আন্দোলন অনেক বেশি ব্যাপ্ত এবং তীব্র হয়েছিল। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খান আব্দুল গফফর খানের নেতৃত্বে পেশওার থেকে আরম্ভ করে বাংলা এবং যুক্তপ্রদেশ এবং পাঞ্জাব থেকে তামিলনাড়ু সর্বত্রই আইন অমান্য আন্দোলন প্রবল গতিলাভ করেচিল। তদুপরি, কৃষিপণ্যেণ মন্দাজনিত মূল্য-হ্রাসে ফলে ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে যে দুর্গতি দেখা দিয়েছিল তার ফলস্বরূপ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ভারতের কৃষকমাজ বিপুল উৎসাহে যোগদান করে। উপজাতীয় এবং আদিবাসী সমাজও বৈম্যমূলক বৃটিশ নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

কিন্তু নগরাঞ্চলে সাময়িকভাবে পুঁজিপতিদের যোগদান বাদ দিলে নগরবাসী এই আন্দোলনে তেমন যেগদান করেননি। তেমনিই বিশের দশকের রাজনৈতিক তিক্ততার দৌলতে মুসলিম সমাজ এই আন্দোলনে গোষ্ঠীগত ভাবে যোগদানে বিরত থাকে।

তবু জনআনোদলনের নিরীখে আইন আমন্য আন্দোলন দুটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, এই আন্দোলনে প্রথমবার ভারতীয় নারী প্রকাশ্য রাজনীতিতে প্রবেশ করে, এবং আইন অমান্য করে বিপুল ংখ্যায় কারাবরণ করে। দ্বিতীয়ত, ভারতের কৃষক শ্রেণীকে রাজনীতির কেন্দ্রীয় বৃত্তের নিয়ে এসে জনমমুখী রাজনীতিতেও এক নতুন দিগন্ত এনে দেয়। এর পরে কৃষক স্বার্থ ভারতীয় রাজনীতির এক অপরিহার্য দিক হিসাবে গণ্য হতে থাকে।

২.৪.৩ গান্ধী-আরউইন চুক্তি দ্বিতীয় গোলটেবিল বেঠক এবং পরবর্তী রাজনীতি

১৯৩০ সালে মাঝামাঝি সময় থেকে ব্রিটিশ দমননীতি আইন আমান্য আনোলনের বিষয়ে গান্ধীকে সন্দিহান করে তোলে। রাজস্ব দিতে অসম্মত হলে কৃষি জমি বিক্রী করে দেবার দরুণ আন্দোলনের তীব্রতা কমার সংকেত পাওয়া যাচ্ছিল। পাশাপাশি, শিল্পপতি এবং পুঁজিপতিরা সরকারের থেকে ইতিবাচক সাড়া পেয়ে গান্ধীকে চাপ দিতে থাকেন আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেবার জন্য।

ইতিোমধ্যে লন্ডনে প্রথম গোলটেবিল বেঠকে কংগ্রেস বাদে ভারতের সব রাজনৈতিক দল যোগ দিলেও কোন সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। ১৯৩০ সালে সাইমন কমিশন রিপোর্টে স্বায়ত্ব শাসনের উল্লেখ না করলেও প্রাদেশিক কসরকার ভারতীয়দের হাতে তুলে দেবার কথা বললে সব দলই তাতে সম্মত হয়ৈ। সেই ক্ষেত্রে কংগ্রেস আইদপত্যের আশঙ্কায় ভারতের ছোট ছোট স্বাধীন রাজন্যগুলি একটি দুর্বল কেন্দ্রীয় যুক্রাজ্য ব্যবস্থার প্রস্তাব দিলে, ব্রিটিশ সরকার এতে সম্মত হয়। কিন্তু কংগ্রেসের অনুপস্থিতিসেত কোন ব্যবস্থাই কার্যকর হবে না বুঝে তারা কংগ্রেসকে আলোচনায় আনতে চায়। কেন্দ্রে দুর্বিল হলেও দায়বদ্ধ সরকারের প্রতিশ্রুতি পেয়ে নরমপন্থী নেতারা গান্ধীকে আন্দোলন স্থগিত রেখে আসন্ন দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে পীড়াপেড়ি করেন।

ফেব্রুযারী-মার্চ ১৯৩০-এ গান্ধী এবং আরউইৰ ব্রিটিশ ভারতের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী সিমলাতে

আলোচনায় বসেন। মার্চ মাসে গান্ধী আরউইন চুক্তিতে গান্ধীর কয়েকটি দাবি আরউইন মেনে নেননি—যেমন সত্যাগ্রীহীদের অধিগৃহীত সম্পত্তি ফেরত দেয়া। কিন্তু ভূমি রাজস্বের হার কমাতে এবং লবন কর শিথিল করতে আরউইন সম্মতি জানান। কংগ্রেসের যুবাকর্মীদর কাছে আরও পীড়াদয়ক ছিল পূর্ণস্বরাজ থেকে গান্ধীর পিছু হটা। আরউইন স্পষ্টই বলে দিয়েছিলেন যে যুক্তরাজ্যের শাসন কাঠামোতে নির্বাদিত ভারতীয় মন্ত্রীদের ক্ষমতা উর্দ্ধতন ব্রিটিশ শাসকদের ক্ষমতার দ্বারা সীমিত থাকে। তা সত্ত্বেও গান্ধী দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানে সম্মত হওয়ায় পূর্ণস্বরাজপন্থীরা হতাশ হয়েছিলেন। তারা চেয়েছিলেন গান্ধর আন্দোলন চালু রাখুন।

গান্ধী দুটি কারণে আরউইন চুক্তি মেনে নেন। প্রথমত, অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন সংস্কার-বিষয়ক আলোচনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে পরে তিন শূন্য হাত ফিরেছিলেন। ১৯৩০-৩১-এ একদিকে কৃষক আন্দোলনে হিংসার প্রবণতা এবং অন্যদিকে পুঁজিপতিদের চাপের মুখে আন্দোলনের য়িনন্ত্রণ হারাবার সম্ভবনা তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার শূন্যহাতে ফেরার অভিলাষ তাঁর ছিল না। দ্বিতীয়ত, আরউইন তাঁর সে। ব্যক্তিগত আলোচনায় বসে কার্যত কংগ্রেসকে ভারতবর্ষের মুখপাত্রের মর্যাদা দিচ্ছিল।

গান্ধর এর সদ্বব্যবহার করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাই ১৯৩২-এ করাচি অধিবেশনে আইন অমান্য আন্দোলন সাময়িকভাবে মুলতুমি করতে গান্ধীকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে সবতেখে বড় বাধা হয়ে র্দাড়ায় সাম্প্রদায়িক সমস্যা। ১৯৩১-সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ধরে চলা এই বৈঠকে মুসলিম, শিক, ভারতীয় খ্রীশ্চান, ইউরোপীয় অধিবাসী এবং নিম্নবর্ণের প্রতিনিধিরা প্রত্যেকেই পৃথক নির্বাচনমণ্ডলী দাবি করতে থাকে। কংগ্রেসের একক প্রতিনিধি হিসাবে গান্ধী দাবি করেন যে কংগ্রেস জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ভারতবাসীর প্রতিনিইদ এবং কংগ্রেস পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা চায় না। ফলত ১লা ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড তিনটি কমিটি নিয়োক গরেন, যাতে ভারতীয় প্রতিনিধিদের মধেয ঐক্যমতের অভাবে ব্রিটিশ একতরফা ভাবে ভারতে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

খালি হাতে ভারতে ফিরে গান্ধী দেখেন ব্রিটিশ দমননীতি আরউইনের পরে আসা বড়লাট উইলিংডনের হাতে অঅরও তীব্র হয়ে উঠেছে। নেহরুর এবং আব্দুল গফফর খান কারারুদ্ধ। গান্ধী পুনরায় আইন আমান্য ান্দোলনের ডাক দিলে চরম নৃশংতার সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার দমননীতি প্রয়োগ করে। ফলে তিন মাসের মধ্যেই যাবতীয় উদ্দীপনা প্রশমিত হয়ে যায়। মার্চ ১৯৩৩-এর মধ্যে ১২০,০০০ সত্যাগ্রী কারারুদ্ধ হয়। ভারতীয়দের নাগরিক অধিকার অবাধে লঙিঘত হয়।

১৯৩২ সালের অগাস্ট মাসে প্রধানমন্ত্রী ম্যাগডোনাল্ড সাম্পরদায়িক বাটোয়ারার কথা ঘোষণা করেন। এতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা দয়ো ছাড়াও ভারতের অস্পৃশ্যদেরও একই অধিকার দেয়া হল। গান্ধী এর বিরুদ্ধে ানশনে বসে হিন্দু সমাজে বিভাজন এড়াতে চাইলেন। ফলে ১৯৩২ সালে পুনা চুক্তি অনুারে আব্দেকার পৃথক নির্বাচনমণ্ডলী ত্যাগ করে সংরক্ষিত আসন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন। সমাজের দলিত শ্রেণীর মধ্যে সচেতনাতা এবং গংগ্রেসের প্রভাব বিস্তার করতে গান্ধীর শুরু করেন তাঁর হরিজন প্রকল্প।

২.৫ নির্বাচনের রাজনীতি থেকে ভারতছাড়ো আন্দোলন

১৯৩৫ থেকে ১৯৪২ সাল ভারতের রাজনীতির জনমুখী চরিত্রকে গণতান্ত্রিক পরিণতির দিকে নিয়ে যাবার পথে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। এই পর্বে রাজনৈতিক চেতনায় সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ ক্রমশ স্বাভাবিক চিন্তাধারায় পরিণত হয়। ১৯৩৭-এ প্রাদেকিশক নির্বাচনে কংগ্রেসের এবং অন্যান্য দলের সাফল্যের অন্যতম কারণ নীতির জনমুখীনতা। সীমিত ক্ষেত্রে কার্যরত প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলি জনমুখী াজনীতি নিজ নিজ রাজনৈতিক মতানুসারে করতে থাকায় গণতান্ত্রিক ভারতের পূর্বচিত্র সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়েছিল।

১৯৩৯-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এসে এই বিকেন্দ্রীকৃত শাসনব্যবস্থার স্বাভাবিক বিবর্তন ব্যাহত করে। যুদ্ধে একতরফা ভাবে ভারতবর্ষকে জড়িয়ে দেবার প্রতিবাদে কংগ্রেস মুখর হলেও কংগ্রেসী অসহযোগীতার সুযোগে অন্যান্য রাজনৈতিক দল সরকাররের সান্দিধয কামনা করে। ফলে ১৯৪২ সালে যখন কংগ্রেস স্বাধীনতার দাবী জানিয়ে ক্রীপসের দৌত্য অস্বীকার করে, রাজনীতিন আঙিনায় কংগ্রেস তখন নিঃসঙ্গ। এহেন পরিস্থিতিতে জনমানসে তথা রাজের দৃষ্টিতে কংগ্রেসের কতৃত্বের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে শু হয় ভারত ছাড়ো আন্দোলন। কিন্তু এই আলেন কংগ্রোসের অজান্তেই হয়ে ওঠে প্রকৃত জন-আন্দোলন। নিয়ন্তরণের রাশ কংগ্রেসের হাতে না থাকায় ভারত ছাড়ো আন্দোলন হয়ে ওঠে ভারতের ইতিহাসের প্রবলতম জন আন্দোলন।

২.৫.১ ১৯৩৫ ভারত শাসন আইন এবং প্রদেশিক কংগ্রেস সরকার

১৯৩৫ সালের বারত শাসন আইন ভারতে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ঘোষণা করে। ১৯৩২-এর পরে একতরফা ব্রিটিশ পদাধিকারীদের মস্তিষ্ক প্রসূত এই আইন ভারতের সব রাজনৈতিক গোষ্ঠীর দ্বারা সমালোচিত হয়।

এই আইনে ইতিবাচক দিক বলতে ছিল প্রাদেশিক স্তরে দ্বৈতশাসনের অবসান। প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা সম্পূর্ণত নির্বাদিত আইনসভার কাছে দায়বদ্ধ থাকবে, যদিও গর্ভনরের হাতে বিশেষ ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে যাতে নির্বাতিচ আইনসভাকে পরয়োজনে উপেক্ষা করে কাজ চালানো যায়। প্রাদেশিক নির্বাচনমরডলীতে ভোটাধিকার প্রাপ্ত নাগরিকের সংখ্যা ৬৫ ক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৩ কোটি করা হয়।

কেন্দ্রীয় যুক্তরাজ্যের কাঠামোতে কেন্দ্রী সরকারের হাতে প্রভূত ক্ষমতা রাখা হয়। কেন্দ্রী শাসনযন্ত্রের বেশ কিছু বিষয় নির্বাচিত মন্ত্রীদের হাতে তুলে দেবার কথা হয় (দিও বিদেশ নীতি, রেলপথ, প্রতিরক্ষা, ইত্যাদি ইংরেজ পদাধিকারীদের হাতে তাকে)। ভারতের আর্থিক স্বাধীনতা প্রায় স্বীকৃত হলেও বড়লাটকে প্রায় র্বময় কর্তৃত্বে বহাল রাখাতে ব্রিটিশ প্রাধান্য অক্ষুন্ন থাকে। কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চমক্ষের ২৭৬ আসনের মধ্যে ১০৪ এবং নিম্নকক্ষের ৩৭৫ আসনের মধ্যে ১২৫টি আসন থাকবে ভারতীয় রাজন্যবর্গের দ্বারা মনোনীত প্রার্থীর জন্য। তবে এই যুক্তরাজ্য সংক্রান্ত ধারা রাজন্যবর্গের ৫০ এর সম্মতি সাপেক্ষ ছিল—এবং এই সম্মতি জ্ঞাপন না করাতে এই অংশটি কোনো দিনই প্রযুক্ত হয়নি।

ভোটাধিকার প্রাপ্ত নাগরিকের সংখ্যা বেড়ে যাওয়াতে কংগ্রেসের রাজনীতিতে জনমুখীনতা আরও বাড়ে। গান্ধীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের সামাজিক এবং রাজনৈতিক কাজের সুফল তো

বটেই, যুক্তপ্রদেশে কিষাণ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে কৃষি সংক্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহরে ফলে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়—বিশেষত লক্ষ্ণৌ এবং ফযেজকুর অধিবেশনে নেহরু সমাজতন্ত্রের দিকে আকর্ষণ অনেককেই আশান্বিত করে।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের প্রাদেশিক আইনসভাগুলির মোট ১৫৮৫ আসনের ৭১১টা কংগ্রেস দখল করে। ১১টি রাজ্যের মধ্যে পাঁচটিতে (মাদ্রাজ, বিহার, ওড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ) সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং বম্বেতে বৃহত্তম দল হবার সুবাদে কংগ্রেস সরকার গঠনের অবস্থায় আসে। এই বিপুল জয়ের অন্যতম বড় কারণ অবশ্যই গান্ধীবাদী জনসংযোগ প্রকল্প এবং ফয়জাবাদের কৃষি কর্মসূচী। কিন্তু এই বিপুল জয় কিছু সমস্যারও উদ্রেক করে। কংগ্রেস এর আগে নীতিগতভাবে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় গভর্নরের বিশেষ অধিকার মানতে অস্বীকার করেছিলঙ্গ নির্বাচন সাফল্যের পরে সরকার গঠনের কথা উঠলে সেই নীতিগত অবস্থানের পরিবর্তনের পক্ষে দক্ষিণপন্থীদের চাপ আসতে থাকে। জুলাই ১৯৩৭ ছটি রাজ্যে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন হয়, কয়েকমাসের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এবং পরের বছর আসামে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। অর্থাৎ বাংলা, সিন্ধু এবং পাঞ্জাব বাদ দিলে দেশের প্রায় সর্বত্তরই কংগ্রেসের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

১৯৩৮-৩৯ সালে কংগ্রেসেরজনসংযোগ বাড়ানোর প্রক্রিয়া ব্যাপক আকার ধারণ করে। যুক্তপ্রদেশে ভূমি সংস্কারের পক্ষে সওয়াল করে কংগ্রেস কিষাণ সভার নেতৃত্ব ধরে রাখলেও বিহার এবং বাংলায় কংগ্রেস ভূমিসংস্কারের পক্ষে ছিল না। প্রায় সব কংগ্রেস শাসিত রাজ্যেই বামপন্থী রাজনীতি কড়া হাতে দমন করার প্রবণতা দেখা যায়। এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক সমস্যার ক্ষেত্রে অবদান। কংগ্রেস ওয়ার্ধার শিক্ষা সম্মেলনে (১৯৩৭) মৌলিক শিক্ষা সম্পর্কিত যে কার্যাবলী গ্রহণ করেছিল, ক্ষমতাসীন হয়ে রাজ্যগুলিতে কংগ্রেস তা বলবৎ করার চেষ্টা করে। এতে নাগরী হরফে হিন্দী চর্চায় জোর দেবার ফলে এবং অজান্তেই হিন্দু মতাদর্শের প্রচারের রূপ দেয়াতে উদুভাষী মুসলিম সত্তা বিপন্ন বোধ করে। তার ওপর হিন্দু কৃষকদের স্বার্থে মুসলিম ভূস্বামীর জমি অধিক্রহনের কথা যুক্ত প্রদেশে বলে, বাংলায় মুসলিম কৃষকের স্বার্থের বিরুদ্ধে ভূমি সংস্কারের বিরোধিতা করাতে কংগ্রেস প্রতিনিয়ত সাম্প্রদায়িক আখ্যা পায়। মুসলিম লীগের তীব্র আক্রমনের মুখে কংগ্রেস সদিচ্ছা ব্যক্ত করা ছাড়া বিশেষ কিছু করতে ব্যর্থ হয় কারণ ওই সময়ে গান্ধী-সুভাষ বিবাদ চরম পর্যায়ে পৌঁছয়।

২.৫.২ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ভারতীয় রাজনীতি

১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ ব্রিটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ৩রা সেপ্টেম্বর ভারতের বড়লাট ভারত সরকারের তরফে ব্রিটেনের হয়ে যোগদানের কথা ঘোষণঅ করেন। ভারত জড়িয়ে পড়ে ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে।

১৯৩৮ সথকেই এই সংকটের পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছিল। কংগ্রেসের বামপন্থী গোষ্ঠী মনে করেছিল ইউরোপে ব্রিটিশ ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে ভারতে গণ-আন্দোলন, প্রয়োজনে গণঅভ্যুত্থান গড়ে তুলে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানোর এটি আদর্শ সময়—এই মতামতের অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। অন্যদিকে ত্রিশের দশকে ইউরোপ ভ্রমণের সুবাদে নেহরু ফ্যাসিবাদ সম্বন্ধে সম্যক ভাবে পরিচিত থাকায়

তীব্র ফ্যাসিবাদী ছিলেন। তিনি চাইছিলেন বিশ্বজোড়া ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামে ভারত ব্রিটেনের পাশে থাকুক। কংগ্রেস নেহরুর মতই কতকটা মেনে নেয়।

ব্রিটেনের হয়ে ভারতের যুদ্ধরত হওয়াতে কংগ্রেসের বিশেষ আপত্তি না থাকলেও ভারতীয় রাজনীতিবিদদের সঙ্গে কোন পরামর্শ না করে একতরফাভাবে ভারতকে যুদ্ধে জড়িয়ে দেওয়া কংগ্রেসের সঙ্গত বলে মনে করেনি। তবু কংগ্রেস যুদ্ধে পূর্ণ সহযোগিতা করতে রাজী ছিলেন দুটি শর্তে—অবিলম্বে প্রকৃত দায়িত্বশীল নির্বাচিত কেন্দ্রী সরকারের গঠন করতে হবে; এবং যুদ্ধোত্তর ভারতের সংবিধান সভা গঠনের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

বড়লাট লিনলিয়গো কংগ্রেসকে বিন্দুমাত্র জমি ছাড়তে নারাজ ছিলেন। ১৯৩৯ সালে এশিয় মহাদেশে যুদ্ধের সম্যক সম্ভবনা ক্ষীণ হওয়ায়, এবং ভাতের আইনের সংশোধনী অনুসারে ১৯৩৯ সালে বড়লাটের প্রভূত ক্ষমতাবৃদ্ধি হওয়াতে, লিননিয়গোর অনমনীয়তা বেড়ে যায়। অক্টোবর মাসে বড়লাট অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতে ভারতকে স্বায়ত্বশাসন দেবার অঙ্গীকার করলে অসন্তুষ্ট কংগ্রেস ২২শে দিসেম্বর ১৯৩৯ সমস্ত প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা থেকে বেরিয়ে আসে। লিনলিযগো স্বায়ত্বশাসন সংক্রান্ত ভাষণে ভারতের বিভিন্ন সম্পদায়ের সম্মতির ওপর ভবিষ্যত কাঠানোর রূপ নির্ভরশীল বলে দেয়াতে, মুসলিম লীগ এবং আম্বেদকারের ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি কংগ্রেসি মন্ত্রীসভার পদত্যাগকে 'মুক্তি দিবস'' বলে ঘোষণা করে।

১৯৪০-এ ব্রিটেন যখন জার্মানীর দ্বারা আক্রান্ত, তখন ভাতের পূর্ণ সমর্থন পেতে স্বয়ং নিলিযগো আপসে রাজি হলেও প্রধানমন্ত্রী চার্চিল তার বিরোধীতা করেন। ফলে ''আগস্ট প্রস্তাব'' (১৯৪০)-এ শুধুমাত্র বড়লাটের শাসনবিভাগ এবং যুদ্ধ উপদেষ্টা কমিটিতে ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্তি ছাড়া নতুন কোন প্রস্তাব ছিল না।

অগাস্ট প্রস্তাবের পরে রামগড় কংগ্রেসে (১৯৪০) গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী গান্ধী মুষ্টিমেয় নেতাদের ব্যক্তিগত সত্যাগ্র প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন। তবু ১৯৪১-৪২ সালে কংগ্রেসের বামপন্থীরা বাদে সবাই ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সমঝোতা চাইছিল। ১৯৪২ পূর্ব এশিয়া জাপানের বিস্ময়কর সাফল্য এবং উপর্যুপরি ব্রিটিশ পশ্চাদপসরেণর (সিঙ্গাপুর, বর্মা, আন্দামন) পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। মার্কিন সরকার এবং জাতীয় সরকারের লেবার সদস্যদের চাপে পড়ে চার্চিল বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি উচ্চপদস্থ প্রতিধিদল পাঠাতে রাজী হন। সরকারের লেবার সদস্য স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের নেতৃত্বে এই দলের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির সহযোগিতা লাভের অদূর ভবিষ্যতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এমনকি হস্তান্তর নিয়ে আলোচনা করা।

ক্রীপস ক্যাবিনেটের যে ঘোষণা পত্র সম্বল করে ভারতে এসেছিল তাতে বলা হয় যুদ্ধোত্তর পর্বে অনতিবিলম্বেই স্বায়ত্বশাসন, এমনকী পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকার দেয়া হব। প্রাদেশিক আইনসভার দ্বারা নির্বাচিত একটি সংবিধান সভা গঠন করা হবে, তবে কোন প্রদেশ ইচ্ছা করলে সংবিধানসভায় যোগদানে বিরত থাকতে পারে। ভারতীয় রাজন্যবর্গ তাঁদের প্রতিনিধি মনোনয়নের অধিকার পাবেন। এবং অনতিবিলম্বেই ভারত সরকারের অন্তবর্তীকালীন শাসনবিভাগে ভারতীয় রাজনীতিবিদদের যোগদানের

ব্যবস্থা করা হবে, যদিও যুদ্ধ-পরিচালনার সর্বময় ক্ষমতা বড়লাটের হাতে থাকবে।

কংগ্রেস প্রাথমিকভাবে ক্রীপসের দৌত্য মেনে নেয়। সংবিধান সভায় যোগদাপ থেকে বিরত থাকতে পারার আশ্বাস পাওয়ায় লীগও আলোচনায় প্রস্তু ছিল। অন্তবর্তী সরকারের যোগদানের ব্যাপারে ঐক্যমত্য হলেও প্রতিরক্ষা বিষয়ক আলোচনায় ক্রীপস ভারতীয়দের হাতে বেশী ক্ষমতা দিতে প্রথমে রাজী থাকলেও লিনলিযগো এবং চার্চিলের আপত্তিতে তা বানচাল হয়ে যায়। সরকারের সর্বময় কর্তৃত্ব ব্রিটিশদের হাতেই ন্যস্ত থাকবে বলাতে কংগ্রেস আলোচনা ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

ক্রীপস মিশন (মার্চ-এপ্রিল ১৯৪০) ব্যর্থ হলে পরে কংগ্রেসের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। গান্ধী একে "Post-dated cheque on a crashing bank" আখ্যা দেন। ক্রীপস প্রস্তাব যে আশা জাগিয়েছিল, তার ব্যর্থতা ততটাই হতাশার জন্ম দেয়। তার ওপর যুদ্ধকালীন রাজনৈতিক তৎপরতার বিষয়ে অসহিষ্ণুতা, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা—সব মিলে যে আবহ তৈরি হয়েছিল তারই সূত্র ধরে গান্ধী ভাতর ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দেন।

২.৫.৩ ভারত ছাড়ো আন্দোলন

১৯৪২-এর গ্রীষ্মে গান্ধী অস্বাভাবিক অনমনীয় হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৩৯ সাল থেকেই ব্রিটিশ দমননীতি তীব্র হয়ে উঠেছিল কারণ ব্রিটিশ শাসকেরা কংগ্রেসকে আন্দোলনে প্ররোচিত করে যুদ্ধকালীন বিশেষ অধিকার বলে কংগ্রেসকে চূর্ণ করে দিতে চাইছিল। ১৯৪২-এর শুরু থেকেই জাপানী আক্রমনের সম্ভবনা প্রবল হতে থাকেঙ্গ পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কর্মরত ভারতীয়দের পরিত্যাগ করে ব্রিটিশরা যেভাবে নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টা করে তাতে ব্রিটিশদের প্রতি ব্যাপক ক্ষোভ জন্মায়। পূর্ব এশিয়া থেকে ফিরে আসা ভারতীয়রা ক্ষোভের সঙ্গে অন্য একটি উপলব্ধিও নিয়ে এসেছিল—প্রবল প্রতাপশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এবারে ভাঙনের মুখে। এর পাশাপাশি যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতীয় অর্থনীতি চরম মূল্যবৃদ্ধি সৃষ্টি করে ব্রিটিশ সরকারে অজান্তেই বাড়িয়ে চলেছিলেন। এসবেরই প্রকাশ ঘটেছিল গান্ধীর অনমনীয়তায়।

গান্ধী মনে করতেন জাপান ভারত আক্রমন করতে পারে যদি ভারতে ব্রিটিশ শাসন অব্যাহত থাকে। তাই ৮ আগষ্ট ১৯৪২ বম্বেতে কংগ্রেসের অধিবেশনে ব্রিটিশ শক্তিকে ভারত ছাড়তে বলেন। গান্ধী তাঁর অনমনীয়ভাবের পরিচয় দিয়ে আন্দোলনকে শুধু অহিংস পথে চলার আহ্বান করেই বিরত থাকেন। তিনি বলেন, কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব কারারুদ্ধ হলে প্রতিটি স্বাধীনতাকামী ভারতবাসী যেন নিজেকে অসিংস পথে পরিচালিত করে। "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে" মন্ত্রের মধ্যেও এই অনমনীয়তা পরিষ্কার হয়ে যায়।

৯ই আগষ্ট ভোররাতেই লিনলিযগো কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় প্রায় সব নেতাকেই কারারুদ্ধ করেন, এবং এক সপ্তাহের মধ্যে প্রাদেশিক কংগ্রেসি নেতৃত্বও কারারুদ্ধ হয়ে যায়। ফলে, কংগ্রেসি জনআন্দোলনের সাধারণত যে নিয়ন্ত্রিত হবার প্রবণতা থাকত তা ১৯৪২-এর আন্দোলনে অনুপস্থিত।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নগরাঞ্চলে প্রবল অস্থিরতা দেখা দেয়। বম্বে ৯-১৪ অগাষ্ট লাগাতার হরতালে নিশ্চল হয়ে পড়ে।

কলকাতায় ১০-১৭ অগাস্ট লাগাতার বনধ্ চলতে থাকে। দিল্লীতে পুলিশ এবং জনতার খণ্ডযুদ্ধে বহু ব্যক্তি হতাহত হয়। পাটনা দুদিনের জন্য ব্রিটিশ শাসকদের হাতছাড়া হয়ে যায়। অন্যান্য শহরেও শ্রমিক ধর্মঘটে নগরজীবন বাহত হয়।

আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে অসন্তোষ শহর ছেড়ে শহরতলী এবং মফস্বলের দিকে এগোতে থাকে। ১৯৩০ সালে আন্দোলন থেকে দূরে থাকা শহরে মধ্যবিত্ত ছাত্র এবং বৃহত্তর যুব সমাজ প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে। রেললাইন উৎখাত, থানা বা অন্যান্য সহকারী কার্যালয় আক্রমণের সংখ্যা দেশজুড়ে রাতারাতি বাড়তে থাকে। ব্রিটিশ রাজের সংযোগ ব্যবস্থা বহুক্ষেত্রে বিপন্ন হয়।

তৃতীয় পর্যায়ে ব্যাপক কৃষক যোগদানের ফলে উপমহাদেশের একটা বড় অংশ উত্তাল হয়ে উঠেছিল। বিহার, যুক্তপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল, মেদিনীপুর, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র এবং কর্নাটকে কৃষক অসন্তোষ ব্যাপক অভ্যুত্থানের আকার নেয়। বিহারে এই আন্দোলনের পূর্ণ কৃতিত্ব ছিল অ-কংগ্রেসি কিষাণ সভার। আন্দোলন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হিংসার আশ্রয় নেয়, এবং অল্প সময়ের জন্য হলেও রামমনোহর লোহিয়া এবং জয়প্রকাশ নারায়ণের মত বামপন্থর কংগ্রেসিদের নেতৃত্বে প্রতি সরকার গঠিত হয়।

মেদিনীপুরে কৃষক জাগরণের ফলে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করেন সতীশ সরকার প্রমুখ নেতা। এই প্রতি-সরকার সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ সাল অবধি।

উড়িষ্যার বালাসোরে কংগ্রেসের নেতৃত্বে কৃষক অব্যুত্থানের যে সূত্রপাত হয় তা স্বরাজ পঞ্চায়েতের গঠনে সাহায্য করে। দৃষ্টান্ত উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বরাজ পঞ্চায়েতের ধারণা ক্রমশ উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। নুরূপভাবে মহারাষ্ট্রে সাতারা এবং খান্দেশ অঞ্চলে কৃষক অভ্যুত্থানের ব্রিটিশ রাজশক্তি পিছু হটতে বাধ্য হয়। আপ্পা সাহেবের নেতৃত্বে সাতারার জাতীয় সরকার এই কৃষক অভ্যুত্থানের সুবাদে বেশ কিছু দিন স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করে।

ভারত ছাড়ো আন্দোলন প্রবল হলেও সর্বব্যাপী হয়নি। কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের সুবাদে সমৃদ্ধ কৃষকরা যে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল—যেমন পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল, গুজরাত, তামিলনাড়ুর এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল—যেসব অঞ্চলে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন আদৌ তীব্রতা লাভ করেনি। তার ওপর মুসলিম লীগ সরকারের পক্ষ অবলম্বন করায় মুসলিম সমাজের একটি বড় অংশও আন্দোলন থেকে দূরে সরে থাকে। ফলে পূর্ববঙ্গ এবং মুসলিম প্রধনা অঞ্চল মোটের ওপর শান্ত ছিল।

তাতেও আন্দোলনের প্রাবল্য নিয়ে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নেই। দলগতভাবে কমিউনিষ্টরা ব্রিটিশ শাসনে পক্ষে থাকলেও তৃণমূল স্তরে কমিউনিষ্ট এবং কংগ্রেস কর্মীরা কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে ১৯৪২-এর গণআন্দোলনকে অহিংস জনআন্দোলনের গন্ডী পার করে এক অভ্যুত্থানের রূপ দিত সাহায্য করেছিল।

১৯৪২-এর মধ্যেই তীব্র দমননীতির দৌলতে উত্তাল ভারতবর্ষকে ব্রিটেন নিয়ন্তরণে আনতে সফল হয়। ১৯৪৩ সালে প্রায় এক লক্ষ লোক কারারুদ্ধ হল। মোট ২০৮টি পুলিশ চৌকি, ৩৩২টি রেল স্টেশন, ৯৪৫টি পোস্ট অফিস আক্রান্ত হয়েছিল। সাড়ে ছ'শোর বেশি বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল সারা দেশ জুড়ে।

গণজাগরণের এই রূপ দেখে ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করে যে যুদ্ধকালে চরম দমননীতি নিয়ে এই আন্দোলন স্তব্ধ করা গেলেও, যুদ্ধোত্তর ভারতে তা সম্ভব হবে না। পেশীবলে ভারতকে সাম্রাজ্যে ধরে রাখা সম্ভব হবে না বুঝেই নবনিযুক্ত বড়লাট কংগ্রেসি নেতৃবর্গকে মুক্তি দিয়ে আলোচনার মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রয়াস শুরু করেন ১৯৪৩-৪৪ সালে। শুরু হয় স্বাধীনতার প্রহর গোনা।

২.৬ সারাংশ

১৯৪২-৪২ ছিল ভারতীয় রাজনীতির জনমুখী হওে ওঠার কাল। বিংশ শতাব্দীর বিশের দশক অবধি ভারতীয় রাজনীতি মূলত সংসদীয় অলিন্দে সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতের রাজনীতি গান্ধীর প্রবেশের পরেই রাজনীতিতে ক্রমশ জনগণের উপস্থিতি এবং গুরুত্ব বাড়তে থাকে।

১৯২০-২২ সাল খিলাফত অসহযোগ আন্দোলন ছিল ভারতের ইতিহাসের পতরথম সর্বভারতীয় নিয়ন্তিরত জন আন্দোলন। তুরস্কের সুলতান ইসলামী দুনিয়ার খলিফার প্রতি অমর্যাদাপূর্ণ আচরণে ক্ষুব্ধ ভারতীয় মুসলিম সমাজ তখন ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সমস্ত রকম অসহযোগিতার কথা ভাবছিল। হিন্দুদের সাহায্য ছাড়া অসহযোগ ব্যর্থ হতে পারে এই আশঙ্কায় তারা হিন্দু-প্রধান কংগ্রেসের সাহায্য চায়। মন্ট-ফোর্ড আইনের হতাশাব্যাঞ্জক ক্ষমতার আংশিক বিকেন্দ্রীকরণের পরে জালিয়াওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড কেন্দ্র করে ব্রিটিশ শাসনের বিশ্বাসযোগ্যতা তখন তলানীতে এসে ঠেকেছে। দেশব্যাপী উত্তেজনার মধ্যে গান্ধী উপলব্ধি করেন হিন্দু-মুসলিম ঐক্য গড়ে ব্রিটিশ বিরোধীতার এর থেকে ভাল অবকাশ আর আসবে না। তাই কংগ্রেসের একাংশের আপত্তি সত্ত্বেও গান্ধী ১৯১৯ সালে ঘোষিত কাউন্সিল নির্বাচন থেকে কংগ্রেসকে দূরে সরিয়ে রেখে জন আন্দোলন শুরু করেন।

১৯২১-২২-এর খিলাফত অসহযোগ আন্দোলন ছিল মূলত শহরে সীমাবদ্ধ ছিল। যুদ্ধোত্তর ভারতে অসন্তোষ নগরবাসীর মধ্যে প্রবল হওয়ায় এবং কংগ্রেসী জনসংযোগ গ্রামাঞ্চলে তেমন ব্যাপ্ত না হওয়াতেই এই সীমাবদ্ধতা তাছাড়া কংগ্রেসের তখনও তেমন নির্দিষ্ট কোন কৃষিকর্মসূচীও ছিল না। তবু বহু জায়গায় গান্ধীর নাম-মাহাত্ম্যকে অবলম্বর করেই কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়ায় আন্দোলনের নিয়ন্ত্রিত অহিংস চরিত্র বিপন্ন হচ্ছিল। ১৯২২ সালে চৌরিচৌরা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাই গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন।

১৯২০-এর দশক তিনটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম, কংগ্রেসের নির্বাচনপন্থী গোষ্ঠী স্বরাজ্য পার্টি নামে দ্বৈতশাসন যন্ত্রে অংশগ্রহণ করে দ্বৈত শাসনরে অসারতা প্রমাণ করলেও শাসন সংস্কার আনতে ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয়ত মুসলিম তিক্ততা বাড়ার সুযোগ নিয়ে ভারতের স্বশাসনের অক্ষমতা প্রমাণ করতে সাইমন কমিশন পাঠানো হয়। এই কমিশনে কোন ভারতীয় না থাকাতে ভারতবাসী এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়, এবং সর্বদলীয় এক সম্মেলনে স্বাধীন ভারতের সংবিধানের রূপরেখা ঠিক করা হয়। কংগ্রেসের যুবাগোষ্ঠী পূর্ণস্বরাজের লক্ষ্যে এগোতে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। ওই সময়েই বিশ্বজনীন অর্থনৈতিক মন্দার পূর্বাভাস ভারতে দেকা যায়। রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক অসন্তোষের প্রতিফলন ঘটে আইন অমান্য আন্দোলনে। এক্ষেত্রে বিশের দশকের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা—গান্ধীর গ্রামীণ উন্নয়ন প্রচেষ্টার সুবাদে কংগ্রেসের গ্রামে গ্রামে উপস্থিতি—জন আন্দোলনকে ব্যাপকতর বিস্তৃতি পেতে সাহায্য করে।

আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয় ডান্ডীতে লবন সত্যাগ্রহ দিয়ে। পরে তা অহিংস মতে সবরকম আইন অমান্যের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের নৈতিক অধিকারকে চ্যালেঞ্জ জানায়। এই আন্দোলনের প্রভাব নগরাঞ্চলে সীমিত থাকলেও গ্রামাঞ্চলে প্রাবল্য লাভ কর। ক্ষেত্রবিশেষে আন্দোলন অহিংসার সীমারেখাও লঙঘন করে যায়। এমতবস্থায় বড়লাট আরউইন গান্ধীকে আন্দোলন থামিয়ে বারতের ভবিষ্যত শাসনসংস্কার নিয়ে আলোচনা করতে লন্ডনে এক গোলটেবিল বৈঠকে আহ্বান করেন। গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুসারে বড়লাট গান্ধীর অল্প কিছু দাবি মেনে নেন, বিনিময়ে গান্ধী গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে যান।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক থেকে খালি হাতে ফিরে ১৯৩০-এর দশকে গান্ধী জনসংযোগ বাড়াতে থাকেন। ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনে প্রদেশিক শাসনরে ভার ভারতীয়দের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেয়া ঠিক হয়। গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসি জনসংযোগ এবং কৃষি-বিষয়ক রাজনৈতিক কর্মসূচীর সুবাদে কংগ্রেস ১৯৩৭-এর প্রাদেশিক নির্বাচনে সাফল্য লাভ করে এবং সব মিলে আটটি প্রাদেশিক মন্ত্রীসভায় যোগ দেয়।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে কংগ্রেস অবিলম্বে স্বায়ত্ব শাসনের দাবি জানায়। বড়লাট সেই দাবি মানায় কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি পদত্যাগ করে। প্রত্যক্ষ সহায়তার বিনিময়ে স্বশাসনর দাবিতে অনড় কংগ্রেস ক্রীপস্ প্রস্তাবের সময় আশান্বিত হয়, কিন্তু তা ব্যর্থ হওয়ায় রাজনৈতিক অস্থিরতা, ব্রিটিশ বিরোধী জনমত এবং জাপানী আক্রমনের সম্ভবনার পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজ সরকারকে ভারত ছাড়তে গণ আন্দোলনের সূচনা করে।

১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের কংগ্রেসি শীর্ষ নেতৃত্ব কারারুদ্ধ হয়। ফলে ইতোপূর্বের জন আন্দোলনে দলের যে নিয়ন্ত্রণ ছিল ১৯৪২-এ তা দেখা যায়নি। রাজনৈতিকভাবে সচেতন এবং ক্ষুব্ধ ভারতবাসী ১৯৪২-এ প্রায় অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ফেলে। চরম দমননীতি নিয়ে সেই জনজাগরণ প্রশমিত করলেও ১৯৪২-এ ব্রিটিশ রাজ বুঝে যায় তদের অন্তিম লগ্ন আসন্ন প্রায়।

২.৭ অনুশীলনী

ক) খিলাফত আন্দোলন কেন অনুষ্ঠিত হয়? এতে কংগ্রেসের অংশগ্রহণের কারণ কী ছিল?

খ) অসহযোগ আন্দোলনের থারা এবং প্রকৃতি আলোচনা করুন।

গ) আইন অমান্য আন্দোলনের ধারা এবং প্রকৃতি আলোচনা করুন।

ঘ) ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বিষয়ে আলোচনা করুন।

ঙ) ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ধারা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন ঃ

ক) খিলাফত কথাটির অর্থ কী? ১৯২০-এর দশকে ভারতবর্ষে খিলাফত আন্দোলন কেন সংঘটিত হয়েছিল?

খ) অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটির কোন নেতা উত্থাপন করেন?

গ) অসহযোগ আন্দোলনের লূত্র ধরে প্রতিষ্ঠিত যে কোন দুটি স্বদেশী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠনের নাম বলুন।

ঘ) বিশের দশকে কংগ্রেসের যে কোন দুজন নির্বাচনপন্থী (Pro-changer) এবং নির্বাচন বিরোধী (No-changer) নেতার নাম উল্লেখ করুন।

ঙ) সাইমন কমিশনের ঘোষিত উদ্দেশ্য কী ছিল?

চ) ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পরে কোন কোন প্রদেশে কংগ্রেস সরকার গঠনে সফল হয়?

ছ) ১৯৩৯ সালে প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলি থেকে কংগ্রেসের সরে আসার কারণ কী ছিল?

জ) ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সূত্রপাতের সময় কোন ব্রিটিশ বড়লাট এক তীব্র দমননীতির আশ্রয় নেন?

২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১) অমলেশ ত্রিপাঠী — স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস — ১৮৮৫-১৯৪৭ (কলকাতা আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৩৭)

২) Sumit Sarkar — Modern India 1885-1947 (Madras, Macmillan India, 1983)

৩) Jupital Brown — Gandhi-A Prisoner of Hope (Oxford University Press)

একক ৩ ❐ কংগ্রেসে বামপন্থী আন্দোলনের উদ্ভব

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ নেতাজি সুভাষ ও আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠা

৩.৩ নেতাজি সুভাষ ও আজাদ হিন্দের কার্যকলাপ

৩.৪ শ্রমিক আন্দোলন

৩.৫ সারাংশ

৩.৬ অনুশীলনী

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৩.০ উদ্দেশ্য

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের বিভিন্ন গতিধারাকে উপলব্ধি করার জন্য বাকপন্থীদের কার্যকলাপ ও পরবর্তী পর্যায়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের কার্যাবলীকে অনুধাবন করা আবশ্যক। সেই উদ্দেশ্যই এই রচনা।

৩.১ প্রস্তাবনা

সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে ১৯১৭ রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৪৮ সালে মার্কস-নব উত্থিত শিল্পনির্ভর ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে বিজ্ঞান ভিত্তিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রয়োগ ১৯১৭ রাশিয়ায় লেনিন করতে সক্ষম হন। জার সাম্রাজ্যের পতন শ্রমিক শেণীর নেতৃত্বে রাষ্ট্র গঠন সারা বিশ্বের শোষিত মানুষের মধ্যে একধরনের আশার সঞ্চার করতে সক্ষম হয়। বিশেষত উপনিবেশবাসীদের মধ্যে একধরনের বিশ্বাস গড়ে ওঠে যে ব্রিটিশ শক্তি ও সাম্রাজ্যবাদ তথা ধনতন্ত্রই একমাত্র ঐতিহাসিক সত্য নয়। তবে ১৯১৭র পর তেকেই যে ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলনে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ জনপ্রিয় হয়েছিল তা নয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধা, বিশেষত রাজশক্তি বিরোধীতায় রাশিয়ায় খবর সংগ্রহ সহজ ছিল না। ফলত ভারতের কমিউনিস্ট ও সোস্যালিস্টতর মধ্যে মার্কস ও অন্যান্য বৈপ্লবিক তত্ত্ব সম্পর্কে একধরনের ওপর ওপর ধারণা গড়ে উঠেছিল। তার চেয়েও বড় কথা ২০ দশকের গেড়ার দিকে গান্ধীর নেতৃত্বে গণ আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনে এক নতুন তাৎপর্য এনেছিল ফলত এই পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্রের বিস্তার বিশেষ ব্যাপকতা লাভ করেনি। কিন্তু ভারতের শিক্ষিত এলিটদের মধ্যে মার্ক্সবাদ যদিও একটা প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ভারতীয়

জাতীয় আন্দোলনে কোনো সমাজতান্ত্রিক আদর্শের নির্যাস পাওয়া যায় না। যদিও মার্ক্স, কেশব সেন ও নৌরজীর সময়কার, লেনিন, গোখলে ও তিলকের সমসায়িক ছিলেনঙ্গ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরই সামগ্রিকভাবে ভারতীয় বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে সমাজবাদের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এঁরা জাতীয়তাবাদী ভাবনায় উদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও গান্ধীর যান্ত্রি কারিগরী বিদ্যার বিলোপ, ধনতন্ত্রের সমালোচনাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে নিতে পারেনি। এর সঙ্গে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময় সমাজতন্ত্রের বিকাশ, ব্রিটিশ শাসকের দমননীতি, অর্থনৈকি সংকট, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশেষত কমিনটনের নির্দেশ এই বিকাশকে প্রভাবিত করেছিল।

বলশেভিক বিপ্লব যে বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ সাড়া ফেলেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় সেই সময়ের লেখা বিভিন্ন রচনায়। S. A. Darge 'Gandhi and Lenin', Muzaffar Ahmed-এর 'নবযুগ' এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। ১৯২০র অক্টোবরে মানবেন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে তাসকন্দে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯২০র পর থেকে ভারতে বেশ কতকগুলো বামপন্থী গোষ্ঠীর ভারতের উদ্ভব হয। পেশোয়ার, কানপুরে বামপন্থী ধারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যার ফলশ্রুতি পেশেয়ার ষড়যন্ত্র মামলা, কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা।

কমিউনিস্ট পার্টির্র কার্যাবলীর সর্বব্যাপী বিস্তারের উদ্দেশ্য তৃতীয় কমিনটনে আলোচনা করা হয়। এই আলোচনায় ঠিক হয় কমিউনিস্টরা কংগ্রেসের বৃহত্তর প্ল্যাটফর্মের মধ্যে থেকে নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় রাখবে। এক্ষেত্রে কংগ্রেসের সহযোগতায় জনগণের কাছে পৌঁছনোটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি নিজস্বতা বজায় রেখে বৈপ্লবিক পার্টি গড়ে তোলাও প্রয়োজনীয় এই দুই উদ্দেশ্য কংগ্রেসের মধ্যে থেকে বামপন্থী আন্দোলন পরিচালনার মধ্যেই সফলতা লাভ করবে বলে কমিউনিস্টরা বিশ্বাস করেছিল।

কমিউনিস্টদের এই উদ্দেশ্য ১৯২৮ দশকে W.P.P. (Workers Preasent Party)র কার্যাবলীর মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। জহরলাল নেহেরু, সুভাষচন্দ্র বোস, ইয়ুথ লিগ ও অন্যান্য বামপন্থী পার্টির সঙ্গে একত্রিত হয়ে W.P.P. জাতীয় আন্দোলনকে দৃঢ়তা দান করেছিল। এই পর্যায়ে সিপিআই বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যে থেকে শ্রমিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এইভাবেই তারা বিশ্বাস করে Dictatorship of proletariat প্রতিষ্ঠিত হবে। W.P.P. তাই বলা যায় শুধুই কমিউনিস্ট পার্টির 'Sub-party' ছিল না। কংগ্রেসের মধ্যে যে বামপন্থীর ছিলো তাদের একটা প্রভাব স্পষ্ট ছিলো কিন্তু W.P.P. এর সদস্যরা যেহেতু একই সঙ্গে কৎগ্রেসেরও সদস্য তাই এই বিভাজনটা স্পষ্ট ছিলো না। W.P.P কংগ্রেসের সঙ্গে অভ্যন্তরে ও বাইরে নিজস্ব ঐতিহ্য বজায় রেখে কংগ্রেসের মধ্যে একটা বামপন্থী চরিত্তর গড়ে তুলতে সম্পূর্ণ না হলেও অনেকাংশেই সক্ষম হয়েছিল। কংগ্রেসের বম্বের মতো প্রাদেশিক খাশায় W.P.P.-র বিশেষ প্রভাব পড়েছিল। ১৯২৮ পর্যন্ত কংগ্রেসের মধ্যেও W.P.P. কার্যাবলী গ্রহণ করার মতো এক ধরনের উদারতা দেখা দিয়েছিলে।

কমিউনিস্টদের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরকারের দমননীতিও বৃদ্ধি পেতে থাকে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা তার অন্যতম উদাহরণ। ১৯২৯-এ ৩ জন কমিউনিস্ট গ্রেপ্তার হন। এদের মুক্তির দাবিতে সোচ্চার হন নেহেরু, আনসারি মতো ব্যক্তিত্বরা।

১৯২৮-এর পর থেকে কমিউনিস্ট পার্টি অনেক বেশি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই বিচ্ছন্নতার কারণ হয়ে দাঁড়ায় কমিউনিস্টদের আভ্যন্তরীণ সমস্যা। তারা কংগ্রেসকে একটা Class Party বা শ্রেণী পার্টি হিসেবে উপলব্ধি করত কংগ্রেস যে একটা বৃহত্তর প্ল্যাটফর্ম তা তারা উপলব্ধি করতে পারেনি। বাস্তবকে না দেখে তারা তত্ত্বের ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছিল। প্রকৃপক্ষে অর্থনৈতিক দিক থেকে যতই শ্রেণীভাগ থাকুক না কেন বিদেশী শকিতর কাছে পদানত হবার অসম্মান সমস্ত শ্রেণীর কাছে এক সুতরাং বুর্জুয়া জাতীয়তাবাদীরা যে প্রকৃতই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী—এই উপলব্ধি তাদের হয়নি। আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তারা মনে করত অর্থনৈতিক অবস্থান আলাদা হলে আদর্শগত অবস্থান আলাদা হতে বাধ্য। তাই যে কোনো গণঅভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে শ্রেণীচরিত্র খোঁজার প্রয়াস কমিউনিস্টদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। কংগ্রেসকে মধ্যবিত্ত বুর্জুয়া ও ভূস্বামীর প্রতিধিত্বের কেন্দ্র হিসেবে সমালোচনা করলেও বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গ কংগ্রেসেই কেন বৃহত সংখ্যক কৃষক শ্রেণী অংশ দিয়েছিল এই প্রশ্নের সমাধান করতে পারেনি উপরন্তু বিভিন্ন সময়ে তাদের কংগ্রেসের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়েছিল।

কমিউনিস্টদের আভ্যন্তরীণ সমস্যার পরিবর্তন ঘটে সপ্তম কমিনটনে এর পর থেকে যেখানে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে ফ্যাসিবাদ বিরোধী শিবির গড়ে তোলার কথা বলে ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিকে একত্রিত করা হয়। এক্ষেত্রে উপনিবেশে জাতীয়তাবাদী বুর্জুয়া শক্তির সঙ্গে বামপন্থীদের আপোষের ক্ষেত্র উন্মোচিত হয়। ফলে এই পর্যায় থেকে কংগ্রেসকেও অন্যভাবে দেখা শুরু হয়। কংগ্রেসে এমন এক গোষ্ঠী যোগদান করে যাদের শিল্পপতি বা ধনতন্ত্রের দুনিয়া থেকে আলাদা করে দেখা হয়।

১৯৩৪-এ সরকার কর্তৃক কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করলে কংগ্রেসের আভ্যন্তরে কাজ করাটা আরো প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। ১৯৩৬-এ Bradley থিসিসে বলেই দেওয়া হয় কংগ্রেসের মধ্যে শ্রেণী চরিত্র খোঁজার প্রয়োজন নেই। কাণ কংগ্রেস হল — 'United front of people' সপ্তম কমিনটনেও ভারতের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টিকে কংগ্রেসের সঙ্গে কাজ করার কথা বলা হয়। কারণ এসময়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা অপেক্ষা ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। যার ফলশ্রুতি কিষাণ সভা, ট্রেড ইউনিয়ন, কেরালা, অন্ধ্র পাঞ্জাব বাংলায় কৃষক আন্দোলন।

যদিও এক্ষেত্রেও তাত্ত্বিক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল বামপন্থী আদর্শের ব্যক্তিগর্গ। প্রথমত তারা মনে করত হিংসাত্মক বিল্পব ছাড়া পরিবর্তন সম্ভব নয়। তিবীয়ত কমিউনিস্টরা কংগ্রেসের মধ্যে থেকে কাজ করলেও কমিউনিস্ট পাটি তখনই একটা শ্রেণী পার্টি হিসেবে গঠিত হবে যখন তা শ্রমিক শ্রেণীর মুখপাত্র হবে এবং এটা তখনই সম্ভব যখন কংগ্রেসের প্রতি তাদের মোহগ্রস্ততার অবসান ঘটবে।

কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিতীয় কমিনটনের পর থেকেই কংগ্রেসের একটা প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েচিল যা নেহেরুর সময়েই সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল। ১৯২৭-এর পর থেকে নেহেরুর নেতৃত্বে যব সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকেই একধরনের চরমপন্থী সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষপাতিত্ব দেকা যায়। এমনকি চন্দ্রশেখর, আজাদ, ভগৎ সিং-এর মত সন্ত্রাসবাদীরাও সমাজবাদী হয়ে ওঠে।

নেহেরু ছাত্রাবস্থায় বিদেশে থাকাকালীন মার্কসবাদের প্রতি আগ্রহী হন। তাঁর সাম্যবাদ প্রকৃতপক্ষে ভারতের জাতীয় আন্দোলনক আর্থ-সামাজিক সাম্যের দিকে ধাবিত করেছিল। আউধে কৃষক বিদ্রোহেই

তার প্রমাণ ১৯২৮-এ তিনি সুভাষের সঙ্গে Independence for India League গড়ে তোলেন ও ১৯২৯ এ লাহোরে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট পদ লাভ করলে কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নেহেরু ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে এক করে League of Independence-এর মাধ্যমে দুটো আন্দোলনকে ত্বরান্তিত করেন। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যেকোনো শক্তিই যে ধনতন্ত্রের বিরোধী এই উপলব্ধি নেহেরুর বক্তব্যের মাধ্যমেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যা মানবেন্দ্র রায় পারেননি। নেহেরু ও সুভাষের নেতৃত্বেই কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী ধারার কার্যাবলী জনমানসে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। নেহেরু কংগ্রেসকে 'multi-class organization;-পরিণত করতে চেয়েছিলেন। এই সময় কংগ্রেস গ্রামীণ অঞ্চলে কৃষকদের সংগঠিত করতে সক্ষম হয়। নেহেরু সমাজতান্ত্রিক মডেলের পক্ষপাতী হলেও তাকে কমিউনিস্ট বলা যায় না এবং এখানেই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে কংগ্রেসের আভ্যন্তরের বামপন্থী আন্দোলনের পার্থক্যকে উপলব্ধি করা যায়। নেহেরু গান্ধীর মতো শ্রেণীদ্বন্দ্বকে অস্বীকার করেননি। কিন্তু একসঙ্গে তিনি 'dictatorship of proletariat' এর কথাও বলেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন শ্রমিক শ্রেণীর সাহায্য ছাড়াও স্বাধীনতা সম্ভব যদিও কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে দিসেয়ছিলেন এর ফলে যে স্বাধীন ভারত গড়ে উঠবে তা হবে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র। প্রকতপক্ষে সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে ভারতীয় পরিস্থতির উপযোগী করে ব্যবহারের মধ্যেই নেহেতু তথা তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রোসের আভ্যন্তরীণ বামপন্থী আন্দোলনের সার্থকতা নিহিত ছিলো।

১৯৩৯-এ Congress Socialist Party-র উত্থান হয়। প্রকৃতপক্ষে ১৯৩০-৩৪-এর মধ্যে কংগ্রেসের যুবক সম্প্রদায় গান্ধীয়ান রাজনীতির প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। নাসিকের জেলে থাকাকালীন মার্কসবাদ ও সমাজবাদের এরা নতুন পার্টি গঠনে উদ্বুদ্ধ হয় যা C.S.P. [Congress Socialist Party] নামে খ্যাত। এই পার্টির গোষ্ঠীরা CPI এর সঙ্গে যেমন একমত হতে পারছিলেন না তেমনি জাতীয় আন্দোলনকে সর্বস্তরে উপনীত করতে চেয়েছিল। বম্বেতে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে এই পাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পার্টির সদস্য নরেন্দ্রদেব সরাসরি ঘোষণা করেন কংগ্রেস ছাড়া এগোনো যাবে না। ফলে C.S.P., AITUC একযোগ কাজ করতে আগ্রহী হয়।

CSP উদ্দেশ্যই ছিলো কংগ্রেসের মধ্যে সমাজবাদ জনপ্রিয় করা ও কংগ্রেসকে দৃঢ়তা দেওয়া হয়। কংগ্রেসের মধ্যে দুবার বামপন্থী নেতৃত্ব বিজিত হয়। ১৯৩৯-এ ত্রিপুরীতে ও ১৯৪০-এ রামগড়ে। কিন্তু এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বাম ও ডান পন্থার ভিত্তিতে যখন কংগ্রেসের বিভাজনের সময় আসে CSP কখনই গান্ধীকে অস্বীকার করেননি। CSP নেতারা জনগণের ওপর গান্ধীর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। জয়প্রকাশ নারায়ণ বলেন — "We solialist do not want to create factions in the congress nor do we desire to displace the old leadership of Congress and to establish revial leadership" —যদিও গান্ধী ১৯৩৯-এ CSP-র সঙ্গে শ্রেণীদ্বন্দ্বে হিংসা প্রভৃতি বিষয়ে মতপার্থক্য প্রকাশ করেনি। তিনি গংগ্রেসের মধ্যে CSP কৃষিসংস্কার বিষয়ে কংগ্রেসকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ১৯৪২-এর আন্দোলনে কমিউনিস্টারা সরে এলেও CSP তাতে যুক্ত হয়। CSP কংগ্রেসের সঙ্গে কাজ করতে পেরেছিল কারণ CPI এর মতো তার কংগ্রেসের বাইরে কোন অস্তিত্ব ছিলো না ফলে অভ্যন্তরে ও বাইরের আদর্শগত সংঘাতের মুখোমুখি CSP কে হতে হয়নি। এটা চিল কংগ্রেসের আভ্যন্তরের একটা গোষ্ঠী কংগ্রেস এর কার্যাবলী থেকে নিজেকে পৃথক অস্তিত্ব রাখার প্রয়োজনও ছিলো না।

৩.২ নেতাজি সুভাষচন্দ্র ও আজাদ-হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠা

সুভাষচন্দ্র প্রথম ও শেষপযন্ত ছিলেন একজন জাতীয়তাবাদী তাই তিনি জাতীয়তাবাদী আদর্শের কোনোরকম সমালোচনা বিরোধী ছিলেন। তাত্ত্বিক জায়গা থেকে জাতীয়তাবাদরে দুধরনের সমালোচনার উল্লেখ করেন তিনি। প্রথম সাংস্কৃতিক আন্তর্জাতিকতাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে অপরটি আন্তর্জাতিক কমিনিসমের দযৃটিকোণ থেকে। এই দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয়তাবাদ ক্ষুদ্র স্বার্থপর একটা গণ্ডিরেখা। কিন্তু সুভাষের মতে ভারতবাসীর মুক্তি একমাত্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে — জাতীয়তাবাদ ছাড়া স্বাধীন চেতনা বিকাশের অন্য কোনো মাধ্যমের কথা তিনি স্বীকার করেননি। তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন আদর্শের সমন্বয়ে। তিনি একইসঙ্গে কমিউনিস্ট ও ফ্যাসিস্ট বা National Socialism জাতীয়তাবোধকে ভিত্তি করে গড়ে ঠঠেছে, আর কমিউনিস্ট আন্দোলন আন্তর্জাতিকতাবাদ ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। সুভাষ এই দুই আদর্শ গ্রহণে উৎসাহী হয়ে একদিকে জার্বানীর জাতীয়দাবাদী ভাবধারার শরিক হতে চেয়েছিলেন তেমনই সোভিয়েত অর্থনৈতিক সাম্যের আদর্শ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন।

সুভাষচন্দ্র যখন রাজনীতিতে যোগ দেন তখন ভারতীয় রাজনীতি বা কংগ্রেস রাজনীতি পরিচালিত হচ্ছিল গান্ধীর নেতৃত্বে। গান্ধী সত্যাগ্রহ ও অহিংস অসহযোগ আন্দোলন উদ্ভাবন করেন। সুভাষচন্দ্র অহিংসার আদর্শে পুরোপুরি বিশ্বাসী না হয়েও গান্ধীর নেতৃত্ব স্বীকার করে নিছিলেন। যেমন নিয়েছিলেন জহরলালও। সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস করতেন আপোষহীরন সংগ্রামে। সুভাষের রাজনৈতিক দর্শনের মূল লক্ষ ছিল দেশবাসীর আর্থ-সামাজিক জীবনের উন্নতি তিনি সমগ্র মানবসভ্যতার জন্য কোন সার্বজনীন সমাধান সূত্রের উথাপন করতে পারেননি। উপরন্তু তিনি ভারতবর্ষে পরিস্থিতি উপযোগী তত্ত্বও তথ্যের মিশ্রণে স্বাধীন ভারতের আদর্শ চিত্র গড়ে তোলেন।

সুভাষচন্দ্র তাঁর লেখা 'Fundamental Problems of India' ইওরোপীয়রা ভারতবর্ষকে সাধু, রাজা, ঋষির দেশ বলে মনে করেন। তিনি মনে করেন ভারতবর্ষকে এভাবে দেখার কারণ ভারতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য এখনও জীবিত। গ্রীস, ব্যাবিলন, মিশরের মত ভারতের প্রাচনী সংস্কৃতি মৃত নয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় ভারতে আধুনিক সভ্যতার বিকাশ হয়নি বরঞ্চ বলা যায়—ভারতবের্ষ প্রাচীন ঐতিহ্য ও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের ধারা সমান্তরলাভাবে প্রবাহিত। তিনি স্বীকার করেন যে পাশ্চাত্য জ্ঞান চর্চার মাধ্যমেই ভারতবর্ষে উদারতন্ত্র, সংবিধানতন্ত্র ও গণতন্ত্রের আদর্শ বিকাশ সম্ভব হয়েছে। বিপ্লবী মতাদর্শও ভারতবর্ষে পশ্চিম থেকেই এসেছে মাৎসিনী গ্যারিবল্ডির জীবনী থেকে ভারতবাসী বিপ্লবী আদর্শ গ্রহণ করেছে। কিন্তু ভারতবাসীর মননকে এই সমস্ত ওপর প্রভাবিত করেনি বরঞ্চ ভারতবাসী পশ্চিমের যুক্তিবাদী রাজনৈতিক ভাবধারা আত্মস্থ করেছে।

তিনি স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি সমাজবাদের সমর্থক ছিলেন এবং শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রকে রাষ্ট্রয়করণ ও ব্যক্তিগত সম্পদের ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা বজায় রাখার পক্ষপাতী চিলেন। একই সঙ্গে তিনি বলশেভিকদের অন্ধ অনুকরণের পক্ষপাতী ছিলেন না ও ভারতবর্ষের পরিস্থিতি অনুযায়ী সমাজবাদের প্রয়োগকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি এটাও

উল্লেখ করেন সোভিয়েত রাশিয়ার একটা পরীক্ষামূলক অধ্যায়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সুতরাং সোভিয়েত রাশিয়াকে প্রগতি ও সাম্যের মূর্ত আদর্শ মনে করাটা উচিত হবে না। তিনি পৃথক কমিউনিস্ট পার্টিরও কোন প্রয়োজন বোধ করেননি। তাঁর মতে জাতীয়তাবাদী পার্টি যদি দেশের কৃষক ও শ্রমিকদের স্বার্থের দিকে মনোযাগী হয় তবে পৃথক কমিউনিস্ট পার্টির কোন প্রয়োজন নেই। আর যে দেশের ৯০% মানুষ শ্রমজীবি সে দেশের জাতীয়তাবাদী পার্টি অবশ্যই শ্রমিক, কৃষকের আর্থ-সামাজিক স্বার্থের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

সুভাষের নিজস্ব রচনা পড়লে এটা খুব স্পষ্ট বোঝা যায় যে তিনি ভারতবর্ষকে স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন—তিনি সাম্রাজ্যবাদের অধীনে স্বায়ত্ত শাসন চাননি। তাঁর মতে ভারতবর্ষ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে স্বতন্ত্র—ভারতবাসী ও ব্রিটিশদের মধ্যে কোনো মিল নেই। সুতরাং ব্রিটিশদের কোনো অধিকার নেই ভারতবর্ষ শাসন করার। তিনি কেনইবা পূর্ণ স্বারাজের পক্ষে সে বিষয়ে তাও তিনি বনে। তিনি মনে করেন রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া শিক্ষা বিস্তার, সমাজ সংস্কার বা শিল্পায়ন সম্ভব নয়—অথচ এই তিন ক্ষেত্রের বিশেষ প্রয়োজন ভারতের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে। নানাজাতির দেশ বলে ভারতবর্ষ বিদেশীদের অধীনে থাকবে নিজেদের স্বাধীন সত্তা বিকাশ করতে সক্ষম হবে তা তিনি মানতে রাজী ছিলেন না। তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার উদাহরণ দেখিয়ে বলেন যে ভিন্নজাতির সমাবেশ সত্তেবও রাষ্ট্র গঠন সম্ভব। তাছাড়া তাঁর মদে ধর্মের ভিত্তিতে যে বিচ্ছন্নতাবাদের কথা ব্রিটিশ সরকার প্রচার করছে তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের সমর্থন নেই বরঞ্চ তারা কংগ্রেসে নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলনকেই সমর্থন করছে। ভারতীয়দের মধ্যেও একটা ধারণা হয়েছে যে ব্রিটিশরা চলে গেলে ভারতবর্ষ তার প্রতিরক্ষা করতে অক্ষম হবে কিন্তু সুভাষের মতে আন্তর্জাতিক শক্তিসাম্যের সঙ্গে কূটনৈতিক চুক্তির সংগঠন ভারতের স্বাধীনতা রক্ষায় তৎপর হবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের পদ্ধতি নিয়ে কংগ্রেসের বয়জ্যেষ্ঠ সেদ্যেদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ মতপার্থক্য ছিল। তিনি পূর্ণ স্বরাজের পক্ষে ছিলেন। কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে ব্রিটিশ সরকার Dominian Status কখনই দেবে না। এক্ষেত্রে ছমাসের জন্য আন্দোলন ব্যাহত রাখার কোন যুক্তি তিনি পাননি। সুভাষের মতে কংগ্রেসের মধ্যে একটা বামগোষ্ঠী বিকশিত হয়েছে এবং এই বাম গোষ্ঠীর দায়িত্ব আন্দোলনের গতি নির্দেশ করা। কংগ্রেসের গান্ধী আন্দোলনের প্রতি যথার্থ সম্মান রেখে তিনি বলেন ২০ দশকে গান্ধীর আন্দোলন যথার্থ বৈপ্লবিক ছিল কিন্তু ৩০ দশকে এই আন্দোলন তার তীক্ষ্ণতা হারিয়েছে এবং যুব সম্প্রয়ায়ের নেতৃত্বে নতুন বামপন্থী আন্দোলনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য পূর্ণ স্বরাজ। তিনি আরো বলেন তাঁর প্রজন্ম ও আগের প্রজন্মের মধ্যে দুটো বিষয়কে কেন্দ্র করে পার্থক্য রয়েছে। পূর্ব প্রজন্মের মধ্যে আধুনিক শিল্প ও আধুনিক সামরিক বাহিনীর সাহায্যে দেশ গঠনের প্রতি অনীহা লক্ষনীয়। কিন্তু যুবসম্প্রদায়ের এই দুটোই আধুনিক যুগের দাবি বলে মনে করে তিনি একইসঙ্গে মনে করেন যুবসম্প্রদায় ও প্রবীণদের মধ্যে এই মতপার্থক্য আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকারক নয় বরঞ্চ এর ফলে আন্দোলনের শক্তি বর্ধিত হবে। তিনি কংগ্রেসের নেতৃবর্গকে মানসিক রক্ষণশীলতা থেকে বেরিয়ে আসতে বলেন। কংগ্রেসের কর্মসূচীতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন অপেক্ষা আপোষের প্রবণতা খুব বেশি বলে তিনি তার সমালোচনা করেন।

তিনি আরও বলেন ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশের ক্ষেত্রে খাদি শিল্পের বিকাশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, এর ফলে গ্রামীণ মানুষের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। তিনি জনগণের অর্থনৈতিক দুরবস্থা মাচনকে আরো গুরুত্ব দেবার কথা বলেন নয়তো জনগণ আন্দোলনকে উৎসাহ হারাবে। তবে তিনি শুধুমাত্র নঞর্থক সমালোচনায় ব্যস্ত ছিলেন না। তিনি সুস্পষ্ট কর্মসূচীও নির্মাণ করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন সমকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে আদর্শ প্রেক্ষাপটের স্বরূপ ব্রিটেনের সাম্রাজ্য ছিল বিশেষ সংকটপূর্ণ অবস্থায়। সুদূর প্রাচ্যে জাপানের উত্থান, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ইটালির শক্তিবৃদ্ধি ব্রিটেনের পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছিল। তাছাড়া সোভিয়েত রাশিয়ার উত্থান যেকোনো সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বিশেষ ভয়ের কারণ ছিল। এই পরিস্থিতিতে বিশ্বযুদ্ধ যে আসন্ন তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং বিশ্বযুদ্ধ যে ব্রিটিশ সরকারের অর্থনীতির ওপর বিশেষ চাপ ফেলবে তাও পষ্ট ছিল। ব্রিটেনের নৌশক্তির জায়গায় সামরিক ক্ষেত্রে বিমান শক্তির উত্থান ব্রিটেনের নৌশক্তিকে গুরুত্বহীন করে তুলেছিল।

সুভাষ এই পরিস্থিতিকে ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামের জন্য কাজে লাগাতে আগ্রহী ছিলেন। 'Democracy of India' তে তিনি লিখেছিলেন এই সময়ের প্রধান কাজ সাইমন কমিশনের বিরোধিতা করা এবং সমস্ত পার্টি একত্রিত হয়ে একটা সংবিধান রচনা করা যা ইংরেজ সরকারকে পুরোপুরি মেনে নিতে হবে। একইসঙ্গে অর্থনৈতিক বয়কটের মাধ্যমে আন্দোলন চালু রাখতে হবে। দুর্বল ও নিরস্ত্রের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র বিদেশী পণ্যের বর্জন। কুড়ি বছর আগে স্বদেশী যুগে এই আন্দোলন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে যথেষ্ট সঙ্কটে ফেলেছিল বলে তিনি মনে করেছিলেন। তিনি কংগ্রেস ও গান্ধীর সমালোচনা করলেও তিনি গংগ্রেসের গুরুত্ব ও গান্ধীর আন্দোলনের পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা বিষয় দ্বিধাহীন ছিলেন। তিনি বামপন্থীদের মনে করিয়ে দেন যে কংগ্রেস স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধানতম গণসংগঠন এর বাইরে বেরিয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করা সম্ভব নয়। তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে Passive resistence মনে করতেন না, তাঁর প্রকৃতপক্ষে হিংসাত্মক বা অহিংসাত্মক কোন প্রকার গণ আন্দোলনেই আপত্তি ছিলো না কিন্তু তাঁর আপত্তি ছিলো আন্দোলন চলাকালীন মাঝে মাঝে বিরতিতে। তাঁর জীবনের স্বপ্ন ছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। তাঁর স্বাধীনতার লক্ষ্য ছিল ভারতবাসীর জীবনের মান উন্নয়ন ও আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্যের প্রতিষ্ঠা। তিনি কোন বিশেষ মতাদর্শ বা দরিদ্র ও পরাধীনতা মোচনের ক্ষেত্রে কোন তাত্ত্বিক সমাধান অপেক্ষা ব্যবহারিক সমাধানে আগ্রহী ছিলেন এবং রাজনৈতিক দর্শনের উপরে ছিল তাঁর দেশপ্রেম।

৩.৩ নেতাজি ও আজাদহিন্দের কার্যকলাপ

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আনয়নের জন্য সুভাষচন্দ্র জার্মানী গিয়ে জার্মানির হাতে বন্দী ভারতীয় সেনাদের নিয়ে তিনি একটি সেনাদল গঠন করে ব্রিটিশের বিরুদেধ যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেন। এটাই ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম পরিকল্পনা। জার্বানীর ভারতীয়রা সুভাষচন্দ্রকে নেতাজি উপাধি দেয় এবং জয়হিন্ত বলে পারস্পরিক অভ্যর্থনার রীতি চালু করে।

ইতিমধ্যে জাপান, ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ৭ই ডিসেম্বর ১৯৪১। এই সময়

ভারতীয় বিপ্লবী রাসবিহারী বসু জাপানে ছিলেন। জাপান দ্রুতগতিতে সিঙ্গাপুর, ব্রহ্মদেশ, মালয় দখল করে নিলে রাসবিহারী বসু দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের নিয়ে সৈন্যদল তৈরি করে ভারত স্বাধীন করার পরিকল্পনা করেন দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভারতের স্বার্থ বিপন্ন করে। ভটনাচক্রে ইতিমধ্যে সিঙ্গাপুরে আজাদহিন্দ ফৌজ গঠনের সূত্রপাত হয়। রাসবিহারী বসু ও ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর যুদ্ধবন্দী উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী মোহন সিং ১৯৪২ সালের ১লা সেপ্টেম্বর আজাদহিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। ব্যাংককে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগ রাসবিহারীকে প্রস্তাব দেয় যে সুভাষচন্দ্রকেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতা করা উচিত। ১৯৪৩এর ৮ই ফেব্রুয়ারি সুভাষচন্দ্র জার্মানি ছেড়ে জাপানে আসেন। কিন্তু তিনি যখন জাপানে আসেন তখন জাপানের নৌ ও বিমান বহর বিপর্যস্ত।

ইতিমধ্যে আজাদহিন্দ বাহিনীর ও নেতাজির যুদ্ধ প্রস্তুতি সকল খবরই ভারতে গোপনে পাচার হচ্ছিল। নেহেরু সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন সুভাষ বসু ভারতে এলে তিনি তার বিরোধিতা করবেন। কারণ তার মতে সুভাষের বাহিনী জাপনীদের হাতের পুতুল ছাড়া আর কিছু নয়।

সুভাষচন্দ্র বলতেন, তাঁর রাজনৈতিক জীবনে তিনি সব সময়েই অনুভব করতেন যে স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য ভারত সবদিক থেকে তৈরি, শুধু তার নেই একটি মুক্তি বাহিনী। ১৯৪২ সালে আগস্ট মাসের মধ্যে ৪০ হাজার ভারতীয় যুদ্ধবন্দী আজাদ বাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯৪৩ সালের ২২শে অক্টোবর সিঙ্গাপুরে সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ বা স্বাধীন ভারতের যুদ্ধকালীন সরকারের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেন। ২৩শে অক্টোবর সুভাষচন্দ্র ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি নিজে এই সরকারের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, যুদ্ধ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদ গ্রহণ করেন। অর্থমন্ত্রী হন এ সি চট্টোপাধ্যায়। প্রচার বিভাগ ও মহিলা বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয় যথাক্রমে এস. এ. আয়ার ও লক্ষ্মী স্বামীনাথনের হাতে। উপদেষ্টা ও সচিব হন যথাক্রমে রাসবিহারী বসু ও এম. এ. সহায়।

১৯৪২-এর নভেম্বর জাপানী প্রধানমন্ত্রী তোজো আজাদ হিন্দ সরকারকে জাপানী বাহিনী দ্বারা ইতিমধ্যে অধিকৃত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ছেড়ে দেবার জাপান সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ১৯৪৪-এ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আজাদ হিন্দ বাহিনীর সুবাষ ব্রিগেড বাহিনীর প্রথম ব্যাটেলিয়ন রেঙ্গুন থেকে প্রোম অভিমুখে যাত্রা করে। ১৯৪৪-এ মার্চ মাসে এই ব্যাটেলিয়ানের গৌরবময় ও গুরুত্বপূর্ণ বিজয়লাভ ঘটে ব্রিটিশ বাহিনীর পশ্চিম আফ্রিকা সেনাদলের বিরুদ্ধে। ১৯শে মার্চ ১৯৪৪এ ভারতীয় জাতীয় বাহিনী ভারতের মাটিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। ভারতের জাতীয় বাহিনী মৌডক অধিকার করে ১৯৪৪ সালর মে মাসে। ইতিমধ্যে এপ্রিলের ৮ তারিখ আজাদ হিন্দ বাহিনী কোহিমা অবরোধ করে। এরপর বর্ষা শুরু হলে স্থির হয় বর্ষার পর আজাদ হিন্দ বাহিনী আসামের ভিতর দিয়ে বাংলায় আক্রমণ চালাবে।

ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বিমান বাহিনীর দ্বারা প্রচন্ডভাবে আক্রমণ চালিয়ে জাপানকে কোনঠাসা করে ফেললে জাপান ব্রহ্ম সীমান্ত থেকে তাঁর বিমান বাহিনী যুদ্ধরত এলাকায় সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। এদিকে বর্ষা শুরু হওয়ায় যোগাযোগ ও খাদ্য সরবরাহ বিপর্যস্ত হয়। খাদ্যাভাব, রোগ, শীত, ম্যালেরিয়া ও পার্বত্য অঞ্চলের বিষাক্ত পোকার কামড়ে হাজার হাজার জাপানী

ও আজাদ হিন্দ সৈন্য মৃত্যুবরণ করে। সুভাষ ব্রিগেডের সেনাপতি কর্ণেল শাহনওয়াজ খান দাবি করেছেন ''নানা অসুবিধা সত্ত্বেও এই অভিযানে আমরা ভারতের অভ্যন্তরে ১৫০ মাইল অগ্রসর হয়েছিলাম। কোন রণক্ষেত্রেই আমরা পরাজিত হইনি। এই অভিযানে আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রায় ৪০০০ সৈন্য মৃত্যু বরণ করেছিলেন।'' ১৯৪৪-এ জানুয়ারি মাসে রেঙ্গুনে প্রধান সামরিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৪৪-এ মে মাসে মৌডক দখল করার পর যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হয়। জুন মাসে স্বদেশ রক্ষার্থে জাপানী সনাবাহিনী বর্মা পরিত্যাগ করে ও প্রায় একই সময়ে আধুনিক অস্ত্রের সজ্জিত বিশাল মার্কিন বাহিনী ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে একত্রিত হয়ে ভগ্নস্বাস্থ্য, অস্ত্র ও গোলাবারুদহীন ও প্রায় অনাহারে থাকা আজাদহিন্দ বাহিনীকে প্রবল বিক্রমে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরে। ১৯৪৪-এ সেপ্টম্বরে ব্রিটিশ বহিনী মৌডক পুর্নদখল করে। ইতিপূর্বে ১৯৪৪ সালেই কোহিমা ইম্ফল রণাঙ্গনে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর সম্মিলিত জাপানী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযান পর্যুদস্ত হয়। ১৯৪৬-এ ৬ই আগস্ট হিরোসিমাতে পারমাণবিক বোমা ফেলা হয়। কয়েকদিন পর নাগাসাকিতে এই বোমা ফেলার ঘটনা ঘটে। জাপান শান্তি চুক্তির প্রার্থনা জানায় ১৬ই আগস্ট। জাপানের আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের জাতীয় বাহিনীর মুক্তি সংগ্রামে সকল আশা লোপ পায়।

সুভাষচন্দ্র ভারত ছেড়ে জার্মানীতে হিটালারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের মুহূর্ত থেকে ভারতের ব্রিটিশ শাসক ও ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি একত্রে তাঁকে শত্রুপক্ষের দালাল ও ফ্যাসিস্ট বলে ঘোষণা করে। কংগ্রেসও সুভাষচন্দ্রের এহেন কা প্রীতির চোখে দেখেনি। এই তিন পক্ষের মনোভাবের সঙ্গে জনগণের মনোভাবের সমতা ছিল না। যে মুহূর্তে জনগণ জেনে গেল সুভাষচন্দ্রের অপরিসীম আত্মত্যাগের কাহিনী, সেই মুহূতে জনগণের কাছে তিনি হয়ে গেলে নেতাজি। সুভাষচন্দ্রের পক্ষে নিজের কাজের যৌক্তিকতা প্রমাণ করার প্রয়োজন ছিল ভারতের কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে, সাধারণ মানুষের কাছে নয়। কারণ জার্মানীর হাতে ব্রিটেন মার খাচ্ছে বা জাপানের হাতে ব্রিটেন মার খাচ্ছে — এই ব্যাপারটা মানুষ উৎফুল্লভাবে নিয়েছিল। সুভাষচন্দ্র ১৯৪১-এ ২০ এপ্রিল বার্লিন তেকে এক গোপন বেতার ভাষণে বলেন তিনি অক্ষ শক্তির উমেদার নন। জার্মানীতে তাঁর আসার একমাত্র উদ্দেশ্য ভারতের স্বাধীনতা। তাঁর বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ করা হয়েছে সে সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ''আমার দেশবাসীর কাছে আমার পরিচিতির কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমার সমগ্র জীবন একটা দীর্ঘ নাছোড়বান্দা এবং আপোষহীন সংগ্রাম ও এটাই দেশবাসীর প্রতি আমার বিশ্বস্ততা।''

জাপানের আত্মসমর্পনের দুদিন আগেই সুভাষচন্দ্র তা জানতে পারেন। সেরামবান থেকে ১৩ই আগস্ট নেতাজী সিঙ্গাপুর পৌঁছান। আজাদ হিন্দ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা তাঁকে অবিলম্বে অন্য কোথাও আত্মগোপন করার জন্য চাপ দিতে থাকেন। ১৭ই আগস্ট তিনি সায়গন আসেন। দুই ইঞ্জিন বিশিষ্ট একটি জাপানী বোমারু বিমানে অন্যান্য জাপানী অফিসারদের সঙ্গে নেতাজি ও কর্ণেল হবিবুর রহমান ফরথোসার তাইহোকু বিমান বন্দরে পৌঁছান ১৮ই আগস্ট বেলা দুটোয়। এরপর হঠাৎই আগুন ধরে যাওয়ায় বিমান বিধ্বস্ত হয়। নেতাজি আহত হন পরে হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। যদিও নেতাজির মৃত্যু সংবাদ ব্রিটেন ও আমেরিকার গোয়েন্দা দপ্তর বিশ্বাস করেনি। তাঁর মৃত্যু সংবাদ ২১শে আগস্টের পূর্বে

ভারতে প্রচারিত হয়নি। ক্রমশ ভারতে আজাদ হিন্দ ফৌজের কৃতিত্বের সংবাদ ছড়িয়ে যায়। ১৯৪৬-এ মে থেকে অক্টোবরে ২০ হাজার হাজাদ হিন্দ সৈন্য রেঙ্গুন থেকে ভারতে ফিরে আসে। মালয় আর ব্যাংককে ৭ হাজার সৈন্য আত্মসমর্পণ করে। সেনাপতিদের মধ্যে ক্যাপ্টেন সায়গল, ক্যাপ্টেন ধিঁরো ও ক্যাপ্টেন সাহনওয়াজের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়। কিন্তু সাধারণ সৈনিকদের মুক্তি দেওয়া হয়। ১৯৪৬-এ লালকেল্লায় বিচার শুরু হয়। আসামী পক্ষে দাঁড়ায় ভুলাভাই দেশাই, তেজবাহাদুর সপ্রু, জওহরলাল। এই বিচার নিয়ে দেশের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা দেখা দেয়। আজদ হিন্দ ফৌজের উদ্দীপনা ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যেও সংক্রমিত হয়। ফলে ব্রিটিশ শক্তি বিচলিত হয়ে পড়ে। সেনাপতিদের বিচারে মৃত্যুর আদেশ দিয়ে শেষপর্যন্ত তাদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে ১৯৪৬-এর ২১-২৩ নভেম্বর কলকাতায় এক গণবিস্ফোরণ ঘটে যায়। আজাদ হিন্দ বাহিনীর বন্দীদের মুক্তির দাবিতে ছাত্রা মিছিল করে। ২২ ও ২৩ তারিখ সারা শহরে গণ্ডগোল ছড়িয়ে যায়। ট্রাম ও ট্যাক্সি ধর্মঘট পালন করে। জনতা ট্রেনও অবরোধ করে। তাদের ওপর গুলিও চালানো হয়।

সর্বোপরি বলা যায় সামরিক ক্ষেত্রে আজাদ হিন্দ ফৌজের সাফল্য সীমিত হলেও বারতীয় কংগ্রেস তাদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে আজাদ হিন্দকে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছে। যদিও আজাদ হিন্দ বাহিনীর ব্রিটেনকে যুদ্ধে পরাজিত করার ও স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য যথার্থতা লাভ করেনি।

হিউয়ে তাঁর গ্রন্থে বলেছেন একদা অনুভূতিশীল নেতাজি নির্দয় ডিক্টেকারে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর মতের বিরুদ্ধতা করলে কারোর ক্ষমা ছিল না। যদিও অন্য কোনো সূত্রে এক বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়ত আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্য ও স্টাফ অফিসারদের মধ্যে অনেকেই বাহিনী ত্যাগ করে পালিয়ে গেছেন বা ব্রিটিশ বাহিনীতে ফিরে গেছেন এমন নজির পাওয়া যায়। ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় ১৩ই মার্চ ১৯৪৬ সালে প্রচলিত নেতাজির বক্তব্য থেকে। এতে তিনি অভিযোগ করেছেন যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দ্বিতীয় ডিভিশানের পাঁচজন অফিসার বাহিনী ত্যাগ করেছেন। এই ঘটনা বহিনীর যুদ্ধবৃত্তিকে দুর্বল করে তোলে।

২৮শে এপ্রিল ১৯৪৫-এ বর্মা ত্যাগের সময় বাহিনীর সেনাদের মনোবল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাদের সাহসিকতাকে গুরুত্ব দিয়ে বহুবিধ প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু নেতাজি তাঁর বাহিনীর সেনাদের বলেছিলেন ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাদের সম্মুখীন হয়ে জয়হিন্দ বলে চীৎকার করলেই ব্রিটিশ বাহিনীর ভারতীয় সেনারা আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনাদের ওপর গুলি না চালিয়ে তাদের স্বাগত করবে। এই ধারণা যদিও মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

চতুর্থত উপযুক্ত সামরিক শিা ও শঁঙ্খলার অভাব ছিল আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনাদের। এর কারণ অবশ্যই ছিল সময়ে স্বল্পতা। বাহিনীতে অজস্রর স্থানীয় সিভিলিয়ন যোগ দিয়েছিলেন যাদের পর্যাপ্ত সামরিক শিক্ষা দেওয়া হয়নি।

পঞ্চমত, আজাদ হিন্দ বাহিনী অস্ত্র-গুলি, পোষাক থেকে শুরু করে খাবারদাবার সমস্ত কিছুর জন্য জাপানের মুখাপেক্ষী চিল। যুদ্ধের শেষের দিকে মিত্রশক্তির প্রবল আক্রমনে বিধ্বস্ত জাপান এই সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখতে পারেনি।

ষষ্ঠত, মিত্রপক্ষ আমেরিকার বিপুল সাহায্যে বলীয়ান হয়ে উঠতে থাকলেও, জাপানকে সাহায্য করার কেউ ছিলো না। সর্বোপরি বলা যায় নেতাজি ও আজাদহিন্দ বাহিনীর পক্ষে সময় ছিল প্রতিপূল। যখন আজাদ হিন্দ যুদ্ধ শুরু করল, তখন জাপানের সামরিক দুর্বলতা প্রকট হয়ে দেখা দেয়। সামরিক শক্তির বিচারে তারতম্য এতটাই বেশি ছিল যে পেশাদার সামরিক বাহিনী এই ঝুঁকি নিত কি না সন্দেহ।

৩.৪ শ্রমিক আন্দোলন

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃত্তি হল শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া এবং শ্রমিক শ্রেণীকে সুসংগঠিত করা। কংগ্রেসের বামপন্থী নেতৃবৃন্দ শ্রমিকদের সম্পকে উৎসাহী এবং তাঁদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেও দক্ষিণপন্থী নেতাদের মধ্যে শ্রমিকদের সম্পর্কে তেমন উৎসাহ ছিল না। গান্ধীজি প্রথমদিকে শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেও পরে শ্রমিক আন্দোলনে উৎসাহ দেখাননি। অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে শ্রমিকদের সঙ্গে গান্ধীজির কোন সম্পর্ক ছিলো না।

মানবেন্দ্রনাথ রায় কমিউনিস্ট পার্টির দুটো রূপ রাখতে চেয়েছিলেন, একটা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বামপন্থী হিসেবে কাজ করবে, অপরটি সীমাবদ্ধ থাকবে কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে। প্রকাশ্য পার্টির নাম হবে ওয়ার্কাস এ্যান্ড পেজেন্টস পার্টি। এইভাবে কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকদের সঙ্গে গভীর যোগসূত্র স্থাপন করে। পার্টির আদর্শ ও ভাবধারায় শ্রমিকশ্রেণী অনুপ্রাণিত হয়। ১৯২৭-এ ফেব্রুয়ারী ও সেপ্টেম্বর মাসে খড়্গপুরে রেলওয়ে কর্মীরা যে ধর্মঘট করেন তাতে কমিউনিস্টদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। এই ধর্মঘট প্রমাণ করে যে শ্রমিকরা ভি. ভি. গিরি ও এ্যান্ড্রুজের মত নরমপন্থী শ্রমিক নেতার নেতৃত্বে সন্তুষ্ট নয়। যখন এ্যান্ড্রুজ ধর্মঘটকে লিলুয়া ওয়ার্কসপে ছড়িয়ে দেওয়ার কমিউনিস্ট প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করেন তখন ডাঙ্গে তাঁর প্রচণ্ড সমালোচনা করেন।

১৯২৬-এ বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলের শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিস্টদের প্রভাব বাড়তে থাকে। ১৯২৮-এ কমিউনিস্ট প্রভাবিত ওয়ার্কস এ্যান্ড পেজেন্টস পাটির নেতৃত্বে কলকাতা কর্পোরেশন ও চেঙাইল ও বাউড়িয়ার চটকলে ধর্মঘট হয়। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ধর্মঘট হয় বোম্বাইয়ে ১৯২৮-এ। বেতন হ্রাসের বিরুদ্ধে এই ধর্মঘট হয়। কমিউনিস্ট পরিচালিত গিরনি কামগার ইউনিয়ন এই ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেয়। এই ধর্মঘট যে অত্যন্ত সফল হয়েছিল তা ভারত সবিচের কাছে লিখিত বোম্বাইয়ের গভর্নরের এক পত্রেই প্রকাশিত হয়েছে। এই পত্রে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে লিখেছিলেন যে, যথেষ্ট পুলিশ দিয়ে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও একজন শ্রমিকও কাজে যোগ দেয়নি। এই ধর্মঘটের অবসান ঘটে, যখন মিল মালিকরা ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে নতুন হারে বেতন দিতে সম্মত হন। কমিউনিস্ট প্রভাবিত গিরনি-কামগার ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার যেখানে এন. এম. যোশী পরিচালিত ইউনিয়নের সদস্য ছিল ৯৮০০। ১৯২৮-এর পর থেকে বোম্বাইয়ে রেলওয়ে কর্মী ও তেল ডিপোর কর্মচারীদের ওপর কমিউনিস্টদের প্রভাব বাড়তে থাকে।

সুতরাং শ্রমিক আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে সরকার পাবলিক সেফটি বিল ও ট্রেডস্ সিপিউটস্ এ্যাক্ট পাশ করালেন ১৯২৯-এ। আশ্চর্যের কথা এই যে কংগ্রেস এই দুটি বিলের বিরোধিতা করলেও বিতর্কের সময় এক বিরাট সংখ্যক কংগ্রেস অনুপস্থিত ছিলেন। ঐ বছরই ব্রিটিশ সরকার ২০শে মার্চ ভারতের ৩২জন বিশিষ্ট শ্রমিক নেতাকে গ্রেপ্তার করে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অইবযোগে। এই ঘটনাকে বলা হয় মীরাট ষঢ়যন্ত্র মামলাঙজ প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা মুজাফফর আহমেদ, এস. এড. ডাঙ্গে প্রভৃতি গ্রেপ্তার হন। এঁদের সঙ্গে ছিলেন ব্রিটিশ কমিউনিস্ট নেতা বেঞ্জামিন ব্র্যাডলি ও ফিলিপ স্প্যাট। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে এই মামলা বলে বিচারে প্রায় সকলেই দোষী সাব্যস্ত হয়ে কারাদণ্ড ভোগ করেন। পৃথিবীর বহু বিখ্যাত রাজনীতিবিদ, চিন্তাবিদ ও দার্শনিক এই ঘটনাকে নিন্দে করেন।

১৯৩১-এ কমিউনিস্টদের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দেওয়ায় এ.আই.টি.ইউ.সি-তে ভাঙ্গন দেখা দেয়। কিছু কমিউনিস্ট Red Trade Union Cogress প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৩৪-এ শ্রমিক আন্দোলন আবার নতুন শক্তি সঞ্চয় করে। কিন্তু ঐ বছরই জুলাইয়ে কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হয়।

৩.৫ সারাংশ

মার্ক্সের নব উত্থিত শিল্পনির্ভর সমাজব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে বিজ্ঞাভিত্তিক সমাজব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্বের আদর্শে কংগ্রেসেও বামপন্থী আন্দোলনের সূত্রপাত। যা কিনা কমিউটানের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আপন গতিধারার নির্ধারণে তৎপর হয়ঙগ নেহেরুর কর্মতৎপরতা এই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই আন্দোলনের আদর্শ ধরে আন্তর্জাতিক কমিউনিসমের ভাবদারায় সুভাষচন্দ্র তাঁর জাতীয়তাবাদকে ব্যাখ্যা করেন। পরবর্তী পর্যায়ে স্বাধীনতা আন্দোলন সুভাষচন্দ্রের পরিচালনায় ও আজাদহিন্দ বাহিনীর গঠনের মধ্যে দিয়ে আপন গতিময়তায় ফিরে যায়।

৩.৬ অনুশীলনী

১। বামপন্থী আন্দোলনের বিস্তার ও কংগ্রেসের বামপন্থর আন্দোলনের উত্থান ও কার্যাবলী সম্পর্কে একটি সমালোচনামূলক পূবন্ধ লিখুন।

২। কংগ্রেসের মধ্যস্থিত বামপন্থী আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে নেহেরুর কার্যাবলর আলোচনা কর — নেহেরুর তথা বামপন্থী আন্দোলনের কি কোনো সীমাবদ্ধতা ছিলো বলে তুমি মনে কর, যদি থাকে তবে তা কেন বলুন।

৩। বামপন্থী আন্দোলনে সি.এস.পি.-র ভূমিকা পর্যালোচনা করে সি.পি.আই-এর সঙ্গে তার পার্থক্য নির্ণয় করুন।

৪। নেতাজি সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক আদর্শবোধ, ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারণা ও তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা সবিস্তারে আলোচনা করুন।

৫। নেতাজির রাজনৈতিক আদর্শবোধের প্রতিফলনই কি আজাদ হিন্দু বাহিনীর গঠনের ঘটনায় রা পড়ে—তোমার মতামত যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করুন।

৬। নেতাজির অবদান ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিচলানর ক্ষেত্রে বর্তমান উল্লেখযোগ্য তা আজাদ হিন্দ বাহিনীর কার্যকলাপ বর্ণনার মাধ্যমে বোঝান। এই বাহিনী ব্যর্থ কেন হলো?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। W.P.P.-এর পুরো নাম কী?

২। ডাঙ্গে ও মুজাফফার আমমেদের রচনার নাম করুন।

৩। সপ্তম কমিনটনে কী বলা হয়েছিল?

৪। ১৯২৮-এ নেহেরু কার সঙ্গে কী গঠন করেন?

৫। কংগ্রেস স্যোসালিস্ট পার্টির উত্থান করে হয়।

৬। আজাদ হিন্দ বাহিনীর জন্ম কোন সালে হয়েচিল?

৭। নারীদের দ্বারা গঠিত বাহিনীর নাম কী? এই সংগঠনের একজন নেত্রীর নাম লিখুন।

৮। ১৯৪১-এর ৭ই ডিসেম্বর স্মরণীয় কেন?

৯। ১৯৪৪ সাল আজাদ হিন্দ বাহিনীর ক্ষেত্রে স্মরণীয় কেন?

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। অমলেশ ত্রিপাঠী — স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস

২। Sumit Sarkar — Modern India

৩। Bipin Chandra — India's Strugle for Freedom

৪। প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় — আধুনিক ভারত

৫। Leonard A Gordon — Brothers Against the Raj

৬। Tarachand — History of the Freedom Movement

একক ৪ ❐ পাকিস্তান দাবি

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য

৪.১ প্রস্তাবনা

৪.২ ক্ষমতা হস্তান্তর

৪.৩ ক্ষমতা হস্তান্তর পরবর্তী পরিস্থিতি

৪.৪ সারাংশ

৪.৫ অনুশীলনী

৪.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৪.০ উদ্দেশ্য

ইংরেজ সরকারের বিভেদ নীত, হিন্দু মুসলিম সম্পর্ককে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বুঝতে গেলে পাকিস্তান আন্দোলন, স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার পরবর্তী ভারতবর্ষকে অনুধাবন করা আবশ্যক। সাম্প্রদায়িক সমস্যা যা আজও ভারতবর্ষের অন্যতম সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার উৎসকে সন্ধান করা একান্তই প্রয়োজন যাতে করে তার সমাধান করা সম্ভব হয়।

৪.১ প্রস্তাবনা

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়, ইংরেজ সরকারের সার্থক বিভেদ নীতি মুসলমান সম্প্রদায়কে তা থেকে দূরে রাখতে সমর্থ হয়েছিলঙ্গ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন মুসলমান মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী ইংরেজ সরকারের এই টোপ মুসলমানরা সহজেই গ্রহণ করেছিলঙ্গ তাদের অধিকাংশজনই বিশ্বাস করত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হিন্দুদের আন্দোলন এবং তা থেকে মুসলমানদের দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়ঙ্গ যে আন্দোলন ছিল গোটা দেশের পক্ষে ম;লজনক তা হয়ে দাঁড়াল মুসলমানদের চোখে কেবল হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষে মঙ্গলজনক। ধর্মনিরেপক্ষ যুক্ত আন্দোলনের প্রথম সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল। এই পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলেছিল সৈয়দ আহমেদের হিন্দু-মুসলমানে স্বার্থ এক নয়— এহেন ঘোষণা। সৈয়দ আহমেদের এই মতবাদ যেন স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থার নির্বাচন পদ্ধতিটির ভিতর দিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রভাব পূর্বভারতের মুসলমান দৃষ্টিভঙ্গীকে পৃথক মাত্রা দিয়েছিল। আধুনিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত মুসলমান সমাজ সহজেই সাম্প্রদায়িকতার শিকার হয়ে পড়ে। বাংলা তথা ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ধ্বংস করাই কার্জনের লক্ষ্য ছিলো। ১৯০৬ এ ভারত সরকার ভারতবাসীকে কিছু শাসনতান্ত্রিক সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা চিন্তা করছিল ঠিক এই সময়ে চরমপন্থী হিন্দুত্ব ঘেঁষা

আন্দোলনকারীদের হিন্দুদের দেবীর কাছে শপথ নেওয়ার যে পন্থা গ্রহণ করেছিল মুসমানদের পক্ষে তা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তারা হিন্দু আন্দোলনকারীদের থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছিল। বিসার-উল-মুল্ক সহ কয়েকজন মুসলমান নেতা মুসলমাদনের স্বার্থরক্ষার জন্য একটি রাজনৈতিক সংস্থা গঠন করে। এই সংস্থার নীতি ছিল (১) সরকারের কাছে মুসলমান জনগণের মনোভাব পেশ করা (২) ইংরেজ রাজত্ব স্থায়ী করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ও কংগ্রেসি আন্দোলন থেকে মুসলমান সম্প্রদায়কে দূরে সরিয়ে রাখা।

১৯০৬-এ ঢাকায় সর্বভারতীয় মুসলিম সীগের প্রতিষ্ঠা হয়। লীগের প্রধান প্রচার ছিল দেশের বৃহত্তম ও মহত্তম স্বার্থও যদি মুসলমাদের স্বার্থ বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন করে তবে মুসলিম স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। ১৮৮৫ সালের পর থেকে সৈযদ আহমেদের নেতৃত্বে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের লক্ষ্য সফল করার যে প্রয়াস চলছিল ১৯০৬-এ তা পূর্ণ হয়। বিচ্ছিন্নতাবাদ রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। মুসলিম লীগ শুধুমাত্র মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করার প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়ায়। আলিগড় আন্দোলনের আদর্শ ও লক্ষ্যকে ভিত্তি করে লীগের আদর্শ গড়ে ওঠে।

মুসলিম লীগকে সন্তুষ্ট করার জন্য ১৯০৯-এ মার্লি মিন্টো সংস্কারের মুসলমান সম্প্রদায়ক আইন সভায় পৃথক সদস্য নির্বাচনের (Seperate electorate) অধিকার দেওয়া হয়। এইভাবে ভারতের রাজনীতি দ্বিজাতিতত্ত্বের (Two-nation theory) প্রবেশ ঘটে। যদি মুসলমানদের এত আমল দেওয়া কিছুতেই উচিত হয়নি বলে ১৯০৯ সালের ১১ই নভেম্বর মর্লির কাছে মিন্টো স্বীকার করেছন কিন্তু দুজনেই অন্য কিছু করার ব্যাপারে প্রয়োজন অনুভব করেননি। তবে ১৯১১-য় মুসলিম লীগের সোচ্চার প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়।

মুসলিম লীগের রাজনৈতিক কার্যকলাপ বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে না গিয়ে হিন্দু সম্প্রদায় ও জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সকল শক্তি ব্যয় করেছে। জাতীয়তাবাদী শিক্ষিত মুসলমানদের কাছে মুসলিম লীগের এই সীমাবদ্ধতা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মৌলানা মহম্মদ আলি, হাকিম আজমল খান, হাসান ইমান প্রমুখ নেতাদের মধ্যে মুসলিম লীগের কার্যকলাপ সম্পর্কে বিতৃষ্ণা জন্মে গিয়েছিল। তারা সংগ্রামী জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেওয়ার প্রচার অভিযান শুরু করেন। এই ধরনের জাতীয়তাবাদী চেতনা দেওবন্দ নামেক একটি স্থানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাপ্রাপ্ত মুসলমাদের মধ্যেও দেখা গিয়েছিল—আবুল কালাম আজাদ ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য। তবে মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকাংশই বুঝতে পারেননি দেশপ্রেম ধর্মবিরোধী নয়। সাম্প্রদায়কিতা, পাকিস্তান দাবি, ভারত বিভাগ ইত্যাদি যে কোন বিষয় আলোচনা করতে হলে জিন্না সম্পর্কে বিস্তৃত জানা আবশ্যক।

একদা কংগ্রেস সদস্য জাতীয়তাবাদী জিন্না পরবর্তীকালে সাংঘাতিক সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হয়ে মুসলিমদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র স্থাপনের দাবি করেন। Time and Tide নামক পত্রিকায় ১৯৪০-এর জানুয়ারী মাসে তিনি প্রথম দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রসঙ্গ সমর্থন করে প্রবন্ধ লেখেন। ঐ বছরেই মার্চে তিনি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সামনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মলেন, ''একটা জিনিস এমন পরিষ্কার হয়ে গেছে যে আমরা আর সংখ্যালঘু নই, আমরা নিজেরাই একটি পৃথক ও বিশিষ্ট জাতি, আমাদের

ভবিষ্যৎ আমাদের নিজেদের।''

জিন্না রাজনীতি শুরু করেন দাদাভাই নওরোজীর নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে। ঐ সময় তিনি সৈয়দ আহমেদের মতো হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯১৬ সালে জিন্না লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ চুক্তি সম্পানদে প্রভূত সাহায্য করেন। ১৯১৩ সালে মহম্মদ আলির প্ররোচনায় তিনি মুসলিম লীগে যোগ দিলেও এই শর্তে যোগ দিয়েছিলেন যে লীগের লক্ষ্য কংগ্রেসের লক্ষ্য থেকে খুব বেশি আলাদা হবে না। এই সময়ে অনেকেই জিন্নাকে হিন্দু মুসলমান ঐক্যের দূত হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। যদিও লক্ষ্ণৌ চুক্তির ভিত্ততে কংগ্রেস মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন মণ্ডলী মেনে নেয় ও এর ফলে মুসলমানেরা নিজেদের আলা আইডেনটিটি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে।

১৯৩০ সালে মহম্মদ আলির মৃত্যুর পর জিন্না মুসলিম লীগের নেতা হন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর বিভিন্ন প্রদেশের করেকার গঠন করে কংগ্রেস। মুসলিম লীগ সরকারের বাইরেই তেকে যায়। নির্বাচনে বিহার, ওড়িশ্যা, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে। বোম্বেতে ১৭৫টি আসনের মধ্যে ৮৬টি লাভ করে বৃহত্তম দলে পরিণত হয়। বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী কার্যকলাপ জিন্নাকে ক্রমশ হতাশ করে। তিনি উপলব্ধি করতে থাকেন সংখ্যাগুরু মানেই কংগ্রেসী শাসন। আর কংগ্রেসী শাসন মানেই হিন্দুদের শাসন। মুসলিমদের জন্য ভারতে এক পৃথক রাষ্ট্র যা সৈয়দ আহমেদের পরবর্তী রচনার মধ্যে নিহিত ছিল, যা রহমৎ আলি একদা প্রচার করেছিল যা ১৯৩০ এর পর থেকে ইকবালের রচনায় ক্রমবর্ধমান রূপে দেখা যচ্ছিল, তা ক্রমেই জিন্নাকে আকৃষ্ট করেছিল। এতদ্‌সত্তেবও বলা যায় বহু মুসলিম ব্যক্তিত্বই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি সমর্থন করেননি।

১৯৩০ এর কেমবব্রিজ থেকে আসা কিছু ছাত্র যখন পাকিস্তানের দাবি পেল তখন তাদের কাছে জিন্না বলেন, ''আমার নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আমার কতরমেই মনে হচ্ছে যে তোমাদের কথাই ঠিক।'' এই বক্তব্যের পেছনে নিঃসদেহে যে শক্তি বিশেষভাবে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তা ছিল ব্রিটিশ সরকার। গান্ধীর ভূমিকাকেও গুরুত্বহীন করে তোলা যায় না। গান্ধী চেয়েছিলেন সারা ভারতের নেতারা তাঁরই অনুগত বাধ্য (docile) হবেন। এখানেই সদস্যদের মধ্যে বিরোধের সূচনা হয়। জিন্নার সঙ্গে গান্ধীর বিরোধ জিন্নার আধিপত্য স্থাপনের কাজে ব্রিটিশ প্রশাসন তার কূটনীতির সর্বোত্তম প্রক্রিয়া কাজে লাগায়।

কলকলতা কংগ্রেসের প্রাক্কালে ১৯২৮ সালের ২৮ থেকে ৩১ আগস্ট লক্ষ্ণৌ সর্বদলীয় সম্মেলনে জিন্নার সংশোধনী প্রস্তাব প্রত্যাখান করে কংগ্রেসের কোন কোন নেতা প্রশ্ন তোলেন, মুসলমানদের হয়ে কথা বলার অধিকার জিন্নার আছে কি? প্রকৃতপক্ষে জিন্না সঙ্গে বোঝাপড়ার পথে অনতিক্রম্য বাধা তৈরি করেন কংগ্রেসের ওপরতলার অদূরদর্শী কংগ্রেস নেতারা।

মৌলানা আজাদ আফসোস করে লিখেছেন নেহেরুর অনমনীয় আপত্তির জন্য কংগ্রেস ও লীগের মিলনের সম্ভবনা ব্যর্থ হয়। উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রীসভায় আজাদ বলেছেন, দুজন মন্ত্রী নেবার সূত্রে বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু নেহেরুর আপত্তির ফলে তা কমিয়ে একজন করাহয় ফলে আলোচনা ভেঙে যায়। চৌধুরী খালিকুজ্জমান অভিযোগ করেছেন, কংগ্রেস চেয়েছিল লীগের অবলুপ্তি। গান্ধীর ব্যক্তিগত সচিব পেয়ারেলাল কৌশলগত দিক থেকে একে গুরুতর ভুল বলে স্বীকার করেছেন — "a tactical error

of the first mangitude"। পেগুেলের মুন বলেছেন একে অশান্তির মূল উৎস তার তা থেকেই ভারত বিভাজনের সূত্রপাত। কিন্তু মুনের বক্তব্য ঐতিহাসিকদের দ্বারা সামলোচিত কারণ ভারত বিভাজন এত তুচ্ছ করণে ঘটেনি।

পাকিস্তান আন্দোলন, মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদ ও বারত বিভাগ একটি অপরটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রথম দুটি যত শক্তিশালী হয়েছে বারত বিভাগ ততোই অনিবার্য হয়ে উঠেছে। খিলাফৎ আন্দোলনে গান্ধী প্রভাবশালী মৌলভিদের সাহায্য নিয়েছিলেন, যারা কোরানের আয়াত থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা ও কাফের হত্যার আহ্বান জানায়। মৌলানা আজাদ লিখিছেন প্যানইসলাম মতবাদ 'শত্রুর শত্রু মিত্র' এই কৌটিল্য নীতি অনুযায়ী কংগ্রেসের মিত্র হতে পারে কিন্তু তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মুসলিম বিচ্ছন্নতাবাদ। মুসলিম চাষী, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত সকলেই ঔপনিবেশিক শাসনের শিকার হওয়া সত্ত্বেও পদের মধ্যে সেই চেতনা জাগানোর চেষ্টা করা হয়নি।

১৯৪০ সালে লাহোর মুসলিম লীগ অধিবেশনে প্রথম পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়। জিন্না দাবি করেন যে তিনি একাকী মাত্র একজন সচিব ও একটি টাইপরাইটারের সাহায্যে পাকিস্তান ছিনিয়ে এনেছেন মুসলমানদের জন্য। জিন্না মুসলমানদের কাছে নিজেকে রাজনৈতিক মুক্তিদাতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন।

পাকিস্তান দাবি, পাকিস্তানের ডিচন্তা ও জিন্নার রাজনীতি ভারতীয় জারনীতি ও সমাজের ওপর ভয়াবহ প্রতিক্রিরর সৃষ্টি করে। মুসলমানদের মধ্যে চরমপন্থী রাজনীতির উদ্ভব ঘটে।

নেহেরু মনে করতেন জনগণের অর্থনৈতিক সমস্যার সুষ্ঠ সমাধানই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করতে পারবে। জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ এই দুই শক্তি নেহেরুর মতে ভারতীয় রাজনীতিতে বিদ্যমান। কিন্তু জিন্নার মতে এই দুই শক্তির সঙ্গে অপর একটি শক্তি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সেই শক্তি মুসলমান শক্তি। জিন্নার মতে লীগও দেশের স্বাধীনতা চায় কিন্তু হিন্দু মুসলিম সংহতির পূর্ব শর্ত সংখ্যালঘু প্রশ্নের সমাধান। তাছাড়া কংগ্রেস মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব দাবি করতে পারে না।

১৯৩৫-এ দেখা যায় মুসলিম লীগ মোটেই জনসমর্থন আদায় করতে পারেনি। জিন্না এক্ষেত্রে ইসলাম বিপন্ন—এই জিগির পেলেন। পরিস্থিতি এতটাই মারাত্মক হয়ে ওঠে যে ১৯৭৩ -এ জুনের মধ্যেই পাঞ্জাব ও বোম্বেতে দাঙ্গা দেখা যায়।

১৯৪০-এ লাহোরে লীগের প্রস্তাবে পাকিসকতান শব্দটি ছিলো না। দেশভাগের কথাও এক্ষেত্রে বলা হয়নি। ১৯৪৬ পর্যন্ত লীগ এই অস্পষ্ট প্রস্তাবের কোনো ব্যাখ্যাও দেয়নি। জাপানের পার্ল হারবার আক্রমনের পরেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট চার্চিল সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে ভারতকে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের মর্যাদা দেওয়ার জন্য। ক্রিপস মিশন ভারতে পাঠানো হল যদিও ভারতে তাতেও কোনো সুবিধা হয়নি। হৈ পরিস্থিতিতে রাজা গোপালাচারী ও কমিউনিস্ট পার্টি পাকিস্তানি প্রস্তাব সমর্থন করে বসে। অবশেষে গান্ধীও বাধ্য হলেন—“Let it be a partition between two brothers, if a division there must be” — বলতে।

১৯৪০-এ পাকিস্তান ভাবান মুসলমানদের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে যায়। ১৯৪৬-এর ১৬ই আগস্ট পাকিস্তান নেওয়ার মন্ত্র নিয়ে কলকাতায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সূচনা হল।

সাম্প্রদায়িক রাজনীতি

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ১৯০৬ মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকেই হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার পথ বিস্তৃত হয়। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরই ময়মনসিংহে বিলাতি পণ্য বর্জন কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের বীভৎস প্রকাশ ঘটে। পূর্ববঙ্গ নিয়ে নতুন প্রদেশ গঠনের অর্থই বেশি চাকরির সুযোগ এই ব্রিটিশ প্রচার সাফল্যের সঙ্গে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমান সম্পদায়কে স্বদেশী আন্দোলন থেকে সরিয়ে আনত সক্ষম হয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার দায় এই শ্রেণীর ওপর অনেক ক্ষেত্রে চাপানো হয়। কারণ তারা নিজেদের স্বার্থে যেমন মোল্লা মৌলবিদের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানোর কাজে লাগিয়েছেন। ফলে ১৯০৬ মে মাসে ময়মনসিং জেলার ঈশ্বরগঞ্জে, মার্চ মাসে ১৯০৭-এ কুমিল্লায়, এপ্রিলে মেতে ১৯০৭-এ জামানপুর ময়মনসিংহের দেওয়ানঞ্জ, বক্সিগঞ্জে ব্যাপক হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা শুরু হয়।

এইসব ঘটনার পরিণতিতে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু মহাসভা। ইসলামে ধর্মান্তরিত মালকানা রাজপুত, গুজর, বানিয়াদের হিন্দু ধর্মে ফেরানোর সংকল্প নিয়ে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ শুদ্ধ আন্দোলন শুরু কেরন ১৯২৩-এ। ১৯২৬-এ নাগপুরে হিন্দু আত্মরক্ষা বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হোল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ নামে। হিন্দুসমাজের যাবতীয় বিষয়েই শুধুমাত্র এই সংঘ আলোকপাতে উদ্যত হয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের পক্ষ থেকেই প্রচারিত হয় হিন্দু ও মুসলমান দুটি পৃথক জাতি যরা একত্রে বসবাস করতে পাবে না।

এই সবের পরিণাম ব্রিটিশ শাসকের পক্ষেই সহায়ক হয়েছিল। দুই সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকবাদীরা অশিক্ষিত গরীব মানুষদের সহজেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় জড়িয়ে দিতে পেরেছে। একবার সামান্য কিছু শুরু হলেই তাতে অসামাজিক অপরাধপ্রবণ মানুষরা অংশনিয়ে ঘটনা জটিল করে তোলে। নিরাপদ স্থানে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক দলগুলির নতৃত্ব গোপনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গসায় নানাভাবে সাহায্য করে। জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা যেমন জিন্নার সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসেননি, তেমনি উদারপন্থী নির্মল চ্যাটার্জী, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সাম্প্রদায়িকদের প্রতিরোধ করতে পারেননি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ভারত বিভাগের আন্দোলনও ফলে ধীরে ধীরে তীব্র হয়ে উঠে।

৪.২ ক্ষমতা হস্তান্তর

১৯৪৭ সালে মাউন্টব্যাটেন বড়লাট নিযুক্ত হয়ে আসেন। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন যে সময় অবচয় করা ঠিক হবে না। তিনি রিপোর্ট লিখলেন। 'তড়িঘড়ি কাজ না করলে আমাকে গৃহযুদ্ধের ধাক্কা সামলাতে হবে।' তবে মাউন্টব্যাটনকে ভারত বিভাজনের প্রথাদ উদ্যোক্তা মনে করা অসমীচীন। যেসব ভাষ্যকাররা মাউন্টব্যাটনের একক ব্যক্তিগত উদ্যোগকে অতিরঞ্জিত

করে দেখিয়েচিলেন তাঁরা হলেন—হাডসন, ক্যাম্বেল, জনসন প্রমুখ। মন্ত্রী কমিশনের প্রস্তাব অনুসারে অখণ্ড ভারত মেনে নেওয়ার জন্য তিনি ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে যুক্তি পরামর্শ করেন। তবে কোন সহমত না হওয়াতে ভারত ও পাকিস্তান এই দুই ডোমিনিয়ন গঠনের প্রস্তাবন দেন। জাতীয়তাবাদী নেতারা ভারত বিভাগের সাম্পাদায়িক দাঙ্গা থেকে দেশকে রক্ষা করতে শেষ অবধি ভারত বিভাগের প্রস্তাবে সম্মতি দান করেন। তবে তাঁরা দুই-জাতিতত্ত্বের নীতি গ্রহণ সম্মত হননি। ভারতের মুসলিম লীগ প্রভাবিত অঞ্চলগুলোতেই একমাত্র ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে পৃথক করতে রাজি হন ও যেসব অঞ্চলে মুসলিম লীগের প্রভাব ছিল, শুধুমাত্র সেইঅঞ্চলগুলি ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে আলাদা করতে তাঁরা রাজি হন, এবং যেসব অঞ্চলে মুসলিম লীগের প্রভাব সম্বন্ধে সন্দহ ছিল, সেই অঞ্চলে গণভো গ্রহনের দাবি জানান। যেমন—উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আসামের শ্রীহট্ট জেলা প্রভৃতিতে একবাক্যে জাতীয়তাবাদী নেতারা ভারত বিভাগে রাজি হলেন ঠিকই কিন্তু তা ধর্মের ভিত্তিতে নয়। তারা রাজি হলেন সাম্প্রদায়কি বিভূষিকা নিরসনের উদ্দেশ্যে প্রমোদিত হয়েই এমত অবস্থাতে ভারত বিভাগে সম্মত হওয়া ছাড়া জাতীয়তাবাদী নেতাদের অন্য কোন উপায় ছিলো না। মাউন্টব্যাটন ৩৩রা জুন সুস্পষ্টভাবেই ভারত বিভাগের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। তিনি আরো ঘোষণা করেন যে ১৯৪৮-এর আগেই ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে। বাধ্য হয়েই কংগ্রেস 'অখণ্ড ভারত' পরিত্যাগ করে। 'পাকিস্তান' দাবি স্বীকৃত হওয়াতে মুসলিম লীগ সন্তোষ প্রকাশ করে।

৪.৩ ক্ষমতা হস্তান্তর পরবর্তী পরিস্থিতি

হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা নামক সমস্যা মোকাবিলা করতে হয় সর্বপ্রথম নেহরু সরকারকে। হাজার হাজার মানুষ পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে চলে আসতে থাকেন। অসংখ্য উদ্বান্তুর আগমনের ফলে ভারতে সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে আর্থ-সামাজিক সমস্যা ঘনীভূত হয়ে থাকে। উভয় দেশেই চলে রক্তারক্তি সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা। নেহেরু সরকার তখন একদিকে যেমন হাঙ্গামা দমনে কঠোরনীতি গ্রহণ করে তেমনি অপরদিকে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যেই এক শান্তি সভায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান মহাত্মা গান্ধী। নেহেরু সরকার এটাকে একটা বিপর্যয় বলে গণ্য করে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তারা এই সংকট কাটিয়ে ওঠে।

স্বাধীন ও জোট নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতিও ছিল নেহেরু সরকারের। প্রায় সকল দেশের সঙ্গে ভারত স্বাধীনতার পর কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। যে সকল দেশ তখন স্বাধীন হয়েচিল সেগুলিকে ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বিলম্ব করেনি। যে সমস্ত দেশ স্বাধীনতা আন্দোলন কাটিয়ে তারা ভারতকে দ্বিধাহীনভাবে সমর্থন জানায়। নেহরু সরকার রাশিয়া ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে।

৪.৪ সারাংশ

১৯০৬-এর ঐতিহাসিক পরিস্থিতি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে হিন্দু সম্প্রদায়ের আন্দোলনে পরিণত করে মুসলিম সম্প্রদায়ের পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তান আন্দোলনে পথ তরান্বিত করে। ১৯০৬-এ মুসলিম লীগ এই

পৃথকীকরণের পরিণাম। পরবর্তী পর্যায়ে জোরদার হয় দ্বিজাতিতত্ত্বের সূত্র। জিন্নার তৎপরতা পরিস্থিতি আরো জটিল করে হিন্দু ও মুসলিম সংঘর্ষকে আবশ্যিক করে তোলে যার প্রভাব ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ওপর পড়ে।

৪.৫ অনুশীলনী

১। পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের সম্পর্ক কোথায়?

২। ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে জিন্নার দায়িত্ব কতটা ছিলো তা যুক্তিসহকারে বর্ণনা করুন।

৩। পাকিস্তান আন্দোলনে ব্রিটিশ সরকারের ভূমিকা পর্যালোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রসঙ্গ কে কোথায় কবে উত্থাপন করেন?

২। মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা কবে হয়?

৩। লক্ষ্ণৌ চুক্তি কবে সম্পাদিত হয়?

৪। পাঞ্জাব ও বম্বেতে কোন সময় দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটে?

৪.৬ গ্রন্থপঞ্জী

1) Ayesha Jalal — The sole spokesman.

2) Uma Kaur — Muslims and Pakistan.

3) Bipin Chandra — India after Independence.

4) Maulana A. K. Azad — India wins freedom.